
এ যুগের বিস্ময়
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

এ যুগের বিস্ময়

"অণুবীক্ষণ, মুদ্রাযন্ত্র, ছায়াচিত্র, বৈদ্যুতিক শক্তি, বাষ্পশক্তি, আকাশযান, বেতার প্রভৃতি যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক অবিষ্কার পৃথিবীর বর্তমান উন্নতি সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের কথা সরল সহজ ভাষায় চিত্তাকর্ষক করিয়া বর্ণনা করা।"

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান—
প্রদীপিকা
৬এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র



অদৃশ্য প্রাণী-জগৎ

একলা ঘরে তুমি বসে আছ। চারিদিকে কেউ কোথাও নেই। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ, ঘরে তুমি একলা বসে আছ—আর কোনও প্রাণী সেখানে নেই। কিন্তু সেই একলা ঘরে হয়ত তখন লক্ষ লক্ষ প্রাণী ঠিক তোমারই মত নিশ্চিন্তে অবস্থান করছে। একটা আধটা প্রাণী নয়, লক্ষ লক্ষ প্রাণী তোমাকে ঘিরে সেই ঘরে ঘুরছে-ফিরছে, তাদের বাসনা ও শক্তি অনুযায়ী চলা-ফেরা করছে। যে-সূর্য্যের আলোটুকু জানালার ফাঁক দিয়ে তোমার গায়ে এসে পড়েছে, তাতেই হয়ত লক্ষ লক্ষ প্রাণী বিচরণ করছে। জগতের কোনখানেও তুমি একলা নও।

হয়ত তুমি বলবে লক্ষ লক্ষ প্রাণী যে আমার ঘরের মধ্যে বিচরণ করছে, কই তাদের তো দেখতে পাইনা। শুধু চোখে তাদের দেখা যায় না। এবং শুধু চোখে তাদের দেখা যায় না

বলে, মনে কোরো না যে তারা নেই। এই যে বাতাস বয়ে চলেছে, এই যে জলের গেলাস তোমার সামনে রয়েছে, ঐ জানালায় ঠিক যেখানটিতে হাত দিয়ে তুমি বসে আছ, সর্ব্বত্র এই সব প্রাণীরা নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। এমন কি মেরু-প্রদেশের সেই চির-তুহিনের মধ্যেও তাদের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

ইংরাজীতে এদের অনেক নাম—microbes, bacteria, germs ইত্যাদি। সাধারণতঃ এদের germs বলা হয়। বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুর গবেষণা করে সর্ব্বপ্রথম দেখেছিলেন যে, এই সব দৃষ্টির অগোচর জীবাণুদের মধ্যে কোন কোন শ্রেণীর প্রাণীই আমাদের বহু ব্যাধির জন্য দায়ী। তাদের নাম তিনি দিয়েছিলেন, microbes। আসলে microbes মানে হ'ল—অতি ক্ষুদ্র জীবিত প্রাণী।

এই সমস্ত জীবাণু এত ছোট যে, শুধু চোখে এদের দেখা যায় না। যতদিন না অণুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরী হয়েছিল, ততদিন পর্য্যন্ত এদের অস্তিত্বের কোন সংবাদই মানুষ জানত না। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে এই সব জীবাণুর দল অদৃশ্য থেকে মানুষের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে মিশে, প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে প্রভাব বিস্তার করেছে—মানুষের জীবন-মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ স্বরূপ হয়ে তার পাশে পাশে চলে এসেছে—তবুও মানুষ এদের অস্তিত্বের কথাই জানতে পারে নি। অতীত ইতিহাসে বড় বড় মড়কের কথা আমরা পড়ি। হাজারে হাজারে লোক এক এক মড়কে উচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ভীত হয়ে মানুষ মন্দিরে পুজো

দিয়েছে, গির্জ্জেয় গির্জ্জেয় উপাসনা করেছে, রোগ-শান্তির জন্যে। ভেবেছে, তাদের কোন পাপের শাস্তি স্বরূপ স্বয়ং ভগবান এই ব্যাধি পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভগবান এই সব ব্যাধি পাঠিয়ে দিয়েছেন কিনা, তা কেউ-ই বলতে পারে না—তবে বৈজ্ঞানিকেরা বহুদিন ধরে গবেষণা করে দেখলেন যে, ব্যাধি যিনিই পাঠিয়ে দিন না কেন, মানুষের দেহে ব্যাধি প্রকট হয় সেই সব দৃষ্টির অগোচর জীবাণুদের দ্বারা। জীবাণুরাই এই জগতে মড়ক এবং মহামারী আনে। আজ নানা বৈজ্ঞানিক-অস্ত্রের সাহায্যে মানুষ সর্ব্বদাই সতর্ক হয়ে আছে, যাতে অতর্কিতে এই অদৃশ্য শত্রুর দ্বারা মানুষ আক্রান্ত না হয়।

যে-সে শত্রু নয়, এত বড় ভয়ানক শত্রু মানুষের আর নেই। এক একটা গ্রামকে শ্মশানে পরিণত করার শক্তি যাদের আছে, তাদের যদি আবার চোখে না দেখা যায়, তা হলে যে কি ভয়ানক অবস্থা হয়, তা আমরা মড়কের সময় বুঝতে পারি। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবাণুদের জন্যেই সমস্ত মনুষ্যসমাজ মাঝে মাঝে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।

শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে হলে, তার অস্তিত্বের সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম জ্ঞান সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তাকে দেখতে কেমন, সে কি ভাবে থাকে, কোথায় থাকে, কি খেয়ে বাঁচে, কি ভাবে মরে, কি তার স্বভাব ইত্যাদি সমস্ত খবর তখনই নেওয়া সম্ভব হতে পারে, যখন তাকে দৃষ্টি-সীমার মধ্যে আনা যায়। তাই যতদিন না অণুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরী হয়েছিল, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের অদৃশ্য থেকে এরা পরম নিশ্চিন্ত মনে মানব-সমাজে

রোগের বীজ ছড়িয়ে চলেছিল। মানুষ কল্পনাতে আনতে পারেনি যে তাদের এই কাছেই ঘরশত্রু রূপে এত অসংখ্য প্রাণী রয়েছে। অবশ্য এখানে বলে রাখা দরকার যে, সব জীবাণুই রোগবহ অথবা মানুষের শত্রু নয়, মানুষের পরম মিত্র স্বরূপ বহু বীজাণুও আছে, তাদের কথা পরে বলছি।

জগতে সর্ব্বপ্রথম যে মানুষটি এই সব অদৃশ্য প্রাণীদের সাক্ষাৎ লাভ করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেন, তাঁর নাম হ'ল লিউয়েনহুক। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের ডেল্‌ফট্‌ নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের বংশগত ব্যবসা ছিল, ঝুড়ি, চুপড়ী ইত্যাদি তৈরী করা। বহু কৃতী পুরুষের মত তাঁরও জীবন আরম্ভ হয় অতি সামান্য আয়োজনের মধ্যে। ডেল্‌ফট্‌ নগরের টাউন-হলের তিনি দ্বাররক্ষী ছিলেন। সারাক্ষণই তাঁকে চুপ করে বসে থাকতে হ'ত। সময় কাটাবার জন্যে তিনি সাধারণ কাঁচ ঘসে ঘসে তাকে আতস কাঁচে অর্থাৎ যে কাঁচে ছোট জিনিস বড় দেখায় তাতে, পরিণত করবার চেষ্টা করতেন। এই ছিল তাঁর অবসর-বিনোদন। কুড়ি বছর ধরে এই ভাবে কাঁচ ঘসতে ঘসতে তাঁর মাথায় অণুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরী করবার কল্পনা জাগে। এবং তিনিই জগতে প্রথম কার্য্যকরী অণুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরী করেন। যেদিন তাঁর তৈরী অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের মধ্য দিয়ে তিনি সাধারণ দৃষ্টির অগোচর সেই রহস্যময় জগতের সাক্ষাৎলাভ করেছিলেন, সেদিন জীবনের সেই কল্পনাতীত বিচিত্র লীলা দেখে তিনি বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের নতুন চোখ দিয়ে যেদিকে ফিরে চান, সেই দিকেই অদৃষ্টপূর্ব্ব নতুন জগৎ

তাঁর চোখে পড়তে লাগল। কল্পনার অতীত সব জিনিস তিনি দেখতে লাগলেন। জগতে তাঁর আগে এবং সেই সময় পর্য্যন্ত আর কেউ-ই সেই অপূর্ব্ব রহস্য-লোক চোখে দেখেন নি। যে-সব জিনিস চোখে দেখা যায় না, লিউয়েনহুক সেই সব জিনিস বেশ বড় বড় করে চোখের সামনে দেখতে পেলেন। সামান্য মশার মাথা, মাছির পাখা, মৌমাছির হুল, ফড়িংএর পা এই সব অতি ছোট ছোট জিনিস তিনি এত স্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন এবং তার মধ্যে এমন সব আশ্চর্য্য জিনিস দেখতে পেলেন যে তার যথাযথ বর্ণনা যখন লিখতে লাগলেন তখন নিজেই বিস্মিত হয়ে গেলেন। সেই সব সামান্য কীট-পতঙ্গের অবয়বের মধ্যে সে কি অপূর্ব্ব গঠন-কৌশল! সঙ্গে সঙ্গে কীট-পতঙ্গাদির বিষয়ে বহু অজ্ঞাত এবং ভ্রান্ত ধারণাও তিরোহিত হতে লাগল।

সমগ্র জগতে তখন মাত্র সেই একটি অণুবীক্ষণ-যন্ত্র এবং তার দর্শক একমাত্র লিউয়েনহুক।

যন্ত্রটিকে তিনি নিজের অঙ্গের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। কিছুদিন পরে দেখলেন যে, এক একটা জিনিসকে পর্য্যবেক্ষণ করে দেখতে অনেক দিন সময় লাগে। প্রত্যেক জিনিসটিই তাঁর কাছে এমন রহস্যময় লাগল যে, সেটাকে তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে আবার সেই যায়গায় আর একটা জিনিস নিয়ে দেখতে তাঁর মন সরছিল না। সেইজন্যে তিনি আরও অনেক অণুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরী করতে লাগলেন। এবং প্রত্যেকটিতে আলাদা জিনিস দিনের পর দিন পর্য্যবেক্ষণ

করতে লাগলেন। এমনি ভাবে এক অপূর্ব্ব নেশা তাঁকে পেয়ে বসল। আজও অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে যখন সাধারণ দৃষ্টির অতীত সেই অদৃশ্য জগতের একটি কণাও চোখে পড়ে, বিস্ময়ে তখন আর চোখ ফেরাতে পারা যায় না। জীবাণুতত্ত্ববিদ্ বন্ধুবর ডাঃ বলাই মুখোপাধ্যায়ের ল্যাবরেটরীতে বেড়াতে গিয়ে জীবনে যেদিন সর্ব্বপ্রথম অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে সেই অদৃশ্য প্রাণী-জগতের সাক্ষাৎ দর্শনলাভের সৌভাগ্য ঘটে সেদিনের বিস্ময় এবং আনন্দ জীবনে ভোলবার নয়। সে বিস্ময় বর্ণনার অতীত! এক ফোঁটা দ্রব্যের অতি সামান্য অংশে দেখি, হাজার হাজার প্রাণী, প্রত্যেকটি আলাদা, ব্যাকুল গতিতে পরস্পর পরস্পরকে পরিক্রমণ করছে, ঘুরছে, ফিরছে। তারপর ধীরে ধীরে একটি একটি করে তারা মরতে লাগল। কয়েক ঘণ্টার পর আবার সেই অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখি এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য, হাজার হাজার সৈন্য মরে পড়ে রয়েছে, মৃতদেহের স্তূপ কাটিয়ে অতি মন্থর গতিতে তখনও একটি কি দুটি ধীরে ধীরে, অতি ধীরে চলেছে। তারপরে তাদেরও গতি থেমে গেল। চেয়ে দেখি, লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। কয়েক ঘণ্টা আগে, জীবনে সেই প্রথম দেখলাম, এক সঙ্গে এত প্রাণী আমারই দৃষ্টি-সীমার মধ্যে প্রাণ-স্পন্দনে নৃত্য করে চলেছে— এত বড় প্রাণীবহুল জগৎ এর পূর্ব্বে এক সঙ্গে আর কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নি। আবার কয়েক ঘণ্টা পরে

জীবনে সেই প্রথম দেখলাম, এক বিরাট শ্মশান—এত মৃতদেহ-ভরা শ্মশান জীবনে আর দেখি নি, দেখা সম্ভবও নয়।

আজ লিউয়েনহুকের কথা বলতে গিয়ে নিতান্ত ব্যক্তিগত এই কথাটির উল্লেখ করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। কারণ সে-বিস্ময়ের স্পন্দন জীবনে ভুলতে পারি নি। চরম সৌভাগ্যের স্মৃতিস্বরূপ সেদিনটা স্বভাবতই চিহ্নিত হয়ে আছে।

লিউয়েনহুক তখন জগতে প্রথম একা সেই অদৃশ্য জগৎ দেখেছিলেন। অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম ছিল তাঁর দৃষ্টিশক্তি এবং তিনি যে ভাবে মানুষের অদেখা সেই সব জিনিসের বর্ণনা লিখতে আরম্ভ করলেন, তাতে সমস্ত জগৎ বিস্ময়ে সচকিত হয়ে উঠল।

একদিন এক ফোঁটা বৃষ্টির জল তিনি অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে গিয়ে দেখেন, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কোথা থেকে এই এক ফোঁটা বৃষ্টির জলে এল অসংখ্য এত প্রাণী! সেই প্রথম তিনি মাইক্রোবদের দেখা পেলেন। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি যে-সব জিনিস পর্য্যবেক্ষণ করেছিলেন, সে-সব জিনিসের সবিশেষ সংবাদ মানুষের জানা না থাকলেও সে জিনিসগুলির সংবাদ মানুষের একেবারে অজানা ছিল না। কিন্তু এবার সহসা তিনি এক সম্পূর্ণ নূতন জগতের সন্ধান পেলেন। নানা রকমের জিনিস পর্য্যবেক্ষণ করেন, আর দেখেন, এ কি বিরাট প্রাণীময় জগৎ আমাদের পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে।

সেই সময় পণ্ডিত লোকেরা ল্যাটিন ভাষায় লিখতেন। লিউয়েনহুক ল্যাটিন ভাষা জানতেন না। তিনি তাঁর মাতৃভাষাতেই ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত রয়েল-সোসাইটিতে এই আবিষ্কার সম্পর্কে চিঠি লিখতে লাগলেন। তাঁর এই সংবাদে সমস্ত বৈজ্ঞানিক মহল সচকিত হয়ে উঠল।

কিন্তু না দেখা পর্য্যন্ত একথা সে-দিন বৈজ্ঞানিকেরা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে পারলেন না।

এক ফোঁটা জলে হাজার হাজার প্রাণী রীতিমত বেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে! এ কি হতে পারে?

রয়েল-সোসাইটি দু'জন বড় বৈজ্ঞানিককে তাঁর কাছে পাঠালেন, কিন্তু তাঁর লেন্‌স্‌ তৈরী করবার কায়দা তিনি



লিউয়েনহুক



লুই পাস্ত্যর

কিছুতেই তাঁদের জানালেন না। লিউয়েনহুক তাঁর অণুবীক্ষণ-যন্ত্রটি কাউকে ছুঁতে পর্য্যন্ত দিতেন না। কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে

পিটার দি গ্রেট, ইংলণ্ডের রাণী এবং আরও সেই সময়ের অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই অদেখা প্রাণী-জগতের স্বরূপ দেখবার জন্যে এসেছিলেন, কিন্তু লিউয়েনহুক কাউকে তাঁর যন্ত্র ব্যবহার করতে দিতেন না।

লিউয়েনহুক ৯০ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর বৈজ্ঞানিক মহলে এই নবাবিষ্কৃত জীবাণু-জগৎ সম্বন্ধে কৌতূহল ধীরে ধীরে কমে এল, যদিও তখন দেশে দেশে অণুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরী হতে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। বৈজ্ঞানিকেরা তখন কল্পনাও করতে পারেন নি যে, এই সব অদৃশ্য প্রাণীদের সঙ্গে মানব-জীবনের কোনও গূঢ় সম্পর্ক থাকতে পারে। সেইজন্য সেদিকে তাঁদের অনুসন্ধিৎসা বিশেষ প্রকট হয়ে ওঠে নি।

যে বছর লিউয়েনহুক মারা যান, তার দু'বছর পরে ইতালীতে একজন বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করলেন, যিনি আবার দৃষ্টির অগোচর সেই সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীদের নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন। তাঁর নাম হ'ল, স্পালান্‌জানি।

একটা জিনিস নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ্য করেছ। একটা ইঁদুর মরে পড়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল যে সেই ইঁদুরের গায়ে কোথা থেকে অসংখ্য পিঁপড়ে পোকা-মাকড় সব হয়েছে। স্বভাবতই মনে এই প্রশ্ন জাগে, হঠাৎ এই সব পোকা-মাকড় কোথা থেকে এল ?

আগে লোকের ধারণা ছিল যে আপনা থেকেই কিংবা সেই প্রাণীর মৃতদেহ থেকেই সেই সব প্রাণী জন্মগ্রহণ করেছে। এই বিশ্বাসকে ইংরাজীতে বলে spontaneous generation,

বাংলায় আমরা বলব স্বতোজনন। অর্থাৎ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, অজৈব পদার্থ থেকে জীবের উৎপত্তি হতে পারে। এবং এই ব্যাপার সম্বন্ধে আগেকার বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও নানা রকমের অদ্ভুত ধারণা সব প্রচলিত ছিল। এরিষ্টটলের মত পণ্ডিত লোকও লিখে গিয়েছেন যে, শুকনো কাপড় যদি অনেকক্ষণ ভিজে অবস্থায় থাকে কিংবা ভিজে কাপড় যদি শুকনো করা হয়, তাহলে সেই ব্যাপার থেকে জীবোৎপত্তি হতে পারে। আর একজন জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক প্রচার করলেন যে, একটা কলসীতে কিছু গম রেখে তার ভেতর ময়লা ন্যাকড়া ঠেসে একুশ দিন রাখলে গমগুলো স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় ইঁদুরে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে ফাদার নিড্হাম বলে একজন পাদ্রী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে এই স্বতোজননবাদকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছিলেন। ইতালী থেকে স্পালান্জানি তাঁর প্রতিবাদ করলেন এবং তিনিই এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করে এক নূতন তথ্য প্রচার করলেন যে, যেখানে জীবন নেই, সেখান থেকে জীবনের উদ্ভব হতে পারে না। জীবাণুরা কি করে আপনা থেকে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে ক্রমশঃ সংখ্যায় বর্দ্ধিত হয়, সে-কথাও তিনিই প্রথম প্রচার করেন। কিন্তু স্বতোজনন সম্বন্ধে চরম প্রমাণ স্পালান্জানিও দিয়ে যেতে পারেন নি। এক শ্রেণীর জীবাণু দৃষ্টির অন্তরালে থেকে তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিচ্ছিল। লুই পাস্তুর এসে সেই নূতন ধরণের জীবাণু, যাকে তাপের প্রভাবেও বিনষ্ট করা যায় না, তার সন্ধান বার করে পরে স্বতোজননবাদের ভ্রান্তি দূর করেন।

স্পালান্জানির মৃত্যুর পর আবার জীবাণু-তত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল। তখন বাষ্প আর বিদ্যুৎ নিয়ে দেশ-দেশান্তরে বৈজ্ঞানিকরা ব্যস্ত। বাষ্প আর বিদ্যুতের মায়া-স্পর্শে তখন জগতে যাদুর খেলা চলেছে। লুই পাস্ত্যর এসে জীবাণু-তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে বিজ্ঞানজগতে যুগান্তর নিয়ে এলেন।

স্পালান্জানির মৃত্যুর ৩২ বছর পরে ফ্রান্সের এক সামান্য পল্লীতে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর লুই পাস্ত্যর জন্মগ্রহণ করেন। লুই পাস্ত্যরের জন্মগ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে মানব-সভ্যতায় একটা নতুন অধ্যায়ের সংযোগ হয়ে গেল। যে অদৃশ্য শত্রু মানুষের দৃষ্টি এবং বুদ্ধির সীমার বাইরে থেকে এতকাল ধরে নিঃশব্দে মানুষের জীবনকে পদে পদে ব্যাহত করে এসেছে, লুই পাস্ত্যর সেই শত্রুর বিরুদ্ধে সমস্ত মানব-সভ্যতার চেতনাকে জাগ্রত করে দিয়ে যান এবং তাঁরই অসামান্য বিজ্ঞান-প্রতিভার সাধনায় জগতে জীবাণু-তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি প্রথমে রসায়নবিদ্যা চর্চ্চা করতেন, এবং রাসায়নিক হিসাবেই তিনি প্রথম বৈজ্ঞানিক মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রথম জীবনে জীবাণু সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোনও কৌতূহল ছিল না।

স্ফটিকের দানা নিয়ে তিনি গবেষণা আরম্ভ করেন। হঠাৎ একটা ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি সেই অদৃশ্য প্রাণী-জগতের উপর এসে পড়ল।

সেই সময় রাসায়নিক হিসাবে তিনি এতদূর কৃতিত্ব অর্জ্জন

করেন যে, ৩২ বছর বয়সেই তিনি লিলি নগরে বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর অধ্যক্ষ হন। বিট, গম এবং শর্করা থেকে গাঁজন-ক্রিয়া দ্বারা সুরাসার তৈরী করার জন্যে এই প্রদেশ বিখ্যাত।

হঠাৎ বিশেষ কি কারণে, যাঁরা এই সুরাসার অর্থাৎ এ্যাল্‌-কোহল্‌ তৈরী করার ব্যবসায় করতেন, তাঁরা দেখলেন, যে-পাত্রে তাঁরা সুরাসার তৈরী করেছিলেন, সেই পাত্র ব্যবহার করলেই, সুরা টকে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে তাঁদের বহু টাকা অনবরত ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। তখন তাঁরা এর কারণ নির্ণয় করার জন্যে পাস্ত্যরকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন। তিনি এসে বহু পরীক্ষার পর দেখলেন, এক রকমের অদৃশ্য প্রাণী, তারা গোপনে এক রকমের এসিড উৎপন্ন করে মানুষের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। তিনি তাদের নাম দিলেন, ল্যাক্‌টিক্‌ এসিড ব্যাক্‌টিরিয়া (ব্যাক্‌টিরিয়া জীবাণুদেরই আর একটি নাম)।

এই ব্যাক্‌টিরিয়ার খবর পাওয়ার সঙ্গে পাস্ত্যরের ধারণা হ'ল যে নিশ্চয়ই আরও এই ধরণের বিভিন্ন রকমের জীবাণু আছে, যারা ঠিক এমনি দৃষ্টির অগোচর থেকে মানুষের ভয়াবহ সব ক্ষতি করছে। কে জানে তাদের কি চরিত্র, কে জানেই বা তাদের কি শক্তি !

তিনি ছিলেন রাসায়নিক। জীব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁকে নতুন করে পড়াশোনা আরম্ভ করতে হ'ল। তাঁর জীবনের এই অধ্যায়ে যে-নিষ্ঠা, যে-একাগ্রতা, যে-পরিশ্রম করবার অসাধারণ শক্তির পরিচয় আমরা পাই, তা সত্যই অনন্যসাধারণ। শুধু

যুগান্তকারী আবিষ্কারক বলে নয়, আদর্শ চরিত্র হিসাবেও পাস্তুরের নাম চিরকাল জগৎ-বরেণ্য হয়ে থাকবে। লোককে আমরা রহস্য করি, কিন্তু পাস্তুর সত্যিই তাঁর নিজের বিয়ের দিন ভুলে গিয়েছিলেন। নিমন্ত্রিত বন্ধুরা গির্জ্জেয় এসে দেখেন, পাস্তুরের খোঁজ নেই। চারিদিকে খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেল যে, তিনি তখন তাঁর ল্যাবরেটরীতে এক মনে গবেষণা করছেন।

স্পালান্‌জানির অসমাপ্ত কাজ তিনি সম্পূর্ণ করলেন। তিনি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করলেন যে, আপনা থেকে, শূন্য থেকে জীবাণু জন্মগ্রহণ করতে পারে না। এক রকম জীবাণু আছে, যাদের তাপের প্রভাবে বিনষ্ট করা যায় না। এই জীবাণুগুলি আগেকার সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় বিদ্যমান থেকে, স্বতোজননবাদের সম্বন্ধে বিতর্ককে ঘোরাল করে তুলেছিল। তিনি দেখালেন যে, জল, বাতাস, ধূলো, ময়লা এই সব জিনিসকে আশ্রয় করে, নিত্য এই সব দৃষ্টির অগোচর জীবাণুর দল এক জিনিস থেকে আর এক জিনিসে যাতায়াত করছে, এক মানুষের দেহ থেকে আর এক মানুষের দেহে যাচ্ছে। সেই দিন থেকে চিকিৎসাজগতে এক নব-যুগের সূচনা হ'ল। এবং তার আদি প্রবর্ত্তক হ'লেন লুই পাস্তুর।

সেই সময় অস্ত্র-চিকিৎসার নামে লোকে আতঙ্কিত হয়ে উঠত। হাসপাতালে লোকে আসতে চাইত না। তার কারণ, অস্ত্র-চিকিৎসার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষতস্থান দূষিত হয়ে উঠত এবং তার ফলে হতভাগ্য রোগীকে যম-যন্ত্রণা ভোগ করে মরতে হ'ত। ধোয়াবার জলে, হাতের আঙুলে, বাতাসে, যে-

ছুরি ব্যবহার করা হতো তারই ডগায় যে অসংখ্য জীবাণু রয়েছে, তারা গিয়ে সেই ক্ষতস্থানকে দূষিত করে দিচ্ছে—এ ব্যাপার মানুষ পাস্তুরের আবিষ্কারের আগে ভাবতেই পারে নি।

পাস্তুর যখন ফ্রান্সে জীবাণু সম্পর্কে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণা করছিলেন সেই সময় ইংলণ্ডে লিষ্টার নামে একজন ডাক্তার রোগীদের সেই অসহ্য যন্ত্রণা দিনের পর দিন দেখে ব্যাকুলভাবে তার প্রতিকারের পথ খুঁজছিলেন। পাস্তুরের আবিষ্কার তাঁর অন্ধকার পথে সহসা আলো জ্বেলে দিল। লিষ্টার পরীক্ষা করে দেখালেন যে, এই সব জীবাণুদের সংস্পর্শ থেকে যদি ক্ষতস্থানটি সংরক্ষণ করা যায়, তাহলে আর ক্ষত দূষিত হ'তে পারে না। এবং এই ভাবে লিষ্টার অস্ত্র-চিকিৎসার ব্যাপারে যুগান্তর নিয়ে এলেন। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, অস্ত্র-চিকিৎসার সময় ডাক্তাররা কি রকম সতর্কতার সঙ্গে যে-সব জিনিষ ক্ষতস্থানের সংস্পর্শে আসবে, তাদের শোধন করে নেন। এই শোধন করার মানেই, সেই সব জিনিসে যদি কোন জীবাণু থাকে, তা নষ্ট করে ফেলা। একজন বড় ইতিহাস-কার লিখেছেন যে, জগতে মানুষ যুদ্ধ করে যত লোককে মেরে ফেলেছে, তার চেয়ে ঢের বেশী লোককে পাস্তুর আর লিষ্টার বাঁচিয়েছেন।

জীবাণুদের নিয়ে পর্য্যবেক্ষণ করতে করতে পাস্তুরের দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে, মানুষের বহু মারাত্মক ব্যাধির মূলে হয়ত আছে এই সব জীবাণু। তিনি ডাক্তারী জানতেন না। নিজের দু'জন ছাত্রের কাছে তিনি তা শিখতে আরম্ভ করলেন। সেই

সময় ফ্রান্সে এবং জার্ম্মাণীতে গৃহপালিত পশু এবং বিশেষ করে ভেড়ার পালে ভয়াবহ মড়ক দেখা গেল। এন্‌থ্রাক্‌স্‌ নামে পশু-রোগে দলে দলে পশু মারা যেতে লাগল। বহু ডাক্তার বহু ভাবে এই রোগ নিবারণ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউই সফল হতে পারলেন না। পাস্ত্যর এই সম্পর্কে বহু গবেষণা করে চিকিৎসা-জগতে আর একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করলেন। জীবাণুরা দেহে প্রবেশ করে রক্তে এক রকম বিষ সঞ্জাত করে। এই বিষই হ'ল আবার সেই রোগের ওষুধ। রুগ্ন দেহ থেকে এই বিষ সংগ্রহ করে যদি প্রতিষেধক টীকা দেওয়া যায়, তাহলে সেই রোগের আক্রমণ থেকে পশুরা বাঁচতে পারে। অবশ্য তাঁর বহু পূর্ব্বে জেনার এই সূত্র অনুসারেই মানুষের দেহের জন্যে বসন্তের প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কার করেছিলেন। পাস্ত্যরের উদ্ভাবিত এই চিকিৎসা-প্রণালীর ফলে জার্ম্মাণী এবং ফ্রান্সের পশু-ব্যবসায়ীরা রক্ষা পেলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বছরে চৌত্রিশ লক্ষ ভেড়াকে এবং প্রায় চার লক্ষ আটত্রিশ হাজার গৃহপালিত পশুকে প্রতিষেধক টীকা দেওয়ার ফলে, ভেড়ার মৃত্যুহার যথাক্রমে শতকরা ১টি এবং অন্যান্য পশুর পক্ষে হাজারে ৩টিতে এসে দাঁড়াল।

তারপর তিনি আর একটি মারাত্মক ব্যাধির চিকিৎসার দিকে দৃষ্টি দিলেন। ক্ষিপ্ত পশুর দংশনে জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসারও তিনি প্রবর্ত্তক। আজ দেশে দেশে পাস্ত্যর-চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছে এবং প্রতি বছরে হাজার হাজার রোগী তাঁর উদ্ভাবিত প্রণালী অনুসারে এই ভয়াবহ রোগের কবল থেকে

মুক্তি লাভ করছে। এই চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কার করে প্রথম যে বালকটির তিনি চিকিৎসা করেন, কুকুরদষ্ট সেই বালকটির একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি ফ্রান্সে আছে।

পাস্ত্যরের সময় থেকেই জীবাণু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মহলে অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার আগ্রহ বিশেষভাবে দেখা যেতে লাগল। একদিন সমুদ্রপথে দেশ-দেশান্তর থেকে দুঃসাহসী নাবিকরা যেমন দলের পর দল বেরিয়েছিলেন সমুদ্রতরঙ্গের পরপারে অজানা সব দেশ আবিষ্কারের জন্য, তেমনি পাস্ত্যরের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত দেশ-দেশান্তরে বৈজ্ঞানিকরা এক বিরাট অনির্দ্দেশ অভিযানে দলের পর দল চলেছেন সেই অদৃশ্য প্রাণী-জগতের রহস্য ভেদ করার জন্যে।

জীবাণু-তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে পাস্ত্যরের পরেই বিখ্যাত জার্ম্মাণ ডাক্তার কখ্-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিই এই তথ্য প্রচার করেন যে, বিভিন্ন ব্যাধির জন্য বিভিন্ন জীবাণু আছে। জীবাণুদের জীবন-প্রণালী সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত ও গবেষণা উক্ত বিজ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ়তর ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। কলেরা এবং টিউবারকুলেসিস, এই দুই কালব্যাধির উৎপত্তি এবং প্রসারের কারণ মানুষের অজানা ছিল। কখ্-ই বহু গবেষণার পর দেখালেন যে, এই দুই ব্যাধির বিভিন্ন জীবাণু আছে। এই জীবাণুরাই এই ব্যাধির প্রসারের কারণ। এই আবিষ্কারের পর থেকে মানুষ এই দুই কালব্যাধির চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে। প্লেগের নাম শুনলে আজও হেন লোক নেই যে ভীত হয়ে ওঠে না।

লাখে লাখে লোক এই রোগের আক্রমণে একদিন মরেছে কিন্তু এই রোগের মূল কোথায় তা মানুষের তখন জানা ছিল না। ইয়ারসিন এবং কিতাসাতু নামে দু'জন জাপানী ডাক্তার এই রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। এই ভাবে জীবাণু-চরিত্র অনুসন্ধান করতে করতে মানুষ বহু কাল-ব্যাধির হাত থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজে পেয়েছে। এবং সে অনুসন্ধান আজও পর্য্যন্ত চলছে।

আগে বলেছি যে, সব জীবাণুই রোগবহ নয়। সব জীবাণুই মানুষের শত্রু নয়। যেমন এক শ্রেণীর জীবাণু মানুষের বহু মারাত্মক ব্যাধির প্রধান বাহন তেমনি বহু জীবাণু আছে যারা মানুষের এবং মানুষের পৃথিবীর পরম বন্ধু। আমরা নিত্য যে-সব দূষিত পচা মরা জিনিস ফেলে দিই, এই-সব জীবাণুরাই তাদের রূপান্তরিত করে পৃথিবীর অতি প্রয়োজনীয় সারে পরিণত করে চলেছে। সেই জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা জীবাণুদের আর একটি নাম দিয়েছেন scavengers of the world, পৃথিবীর যত ময়লা তারাই প্রতিমুহূর্ত্তে পরিষ্কার করে চলেছে। দুধ থেকে যে মাখন তৈরী হয়, ঈয়েষ্ট থেকে যে সুরাসার তৈরী হয়, তার মূলেও এই জীবাণু।

জীবাণুরা যে পরিমাণে বৃদ্ধিলাভ করতে পারে, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। উপযুক্ত খাদ্য পেলে একটি জীবাণু বারো ঘণ্টার মধ্যে এক কোটি আশী লক্ষ জীবাণুতে পরিণত হতে পারে। যে সমস্ত জীবাণু রোগবহ তাদের একটি কি

দুটি আমাদের দেহে একবার প্রবেশ লাভ করতে পারলে দেহের মধ্যে অতি অল্প সময়ের ভিতর তারা লাখে লাখে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

যাদের চোখে দেখা যায়, তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচার করা দুরূহ। যাদের চোখে দেখা যায় না, তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচার করবার উপায় সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। তাই সাধারণ মানুষকে যতদূর সম্ভব জীবাণুদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে থাকতে হয়। বর্ত্তমান স্বাস্থ্যনীতি মানুষকে সেই শিক্ষা দেয়।



১

এক সময়ে একখানি পুঁথি পড়বার জন্য লোককে হাজার মাইল পথ হাঁটতে হ'ত, একথা আজ আমাদের মনেই হয় না। মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় আজ আমরা ঘরে বসে দেশদেশান্তরের যে কোনও বই অতি অল্প খরচে পড়তে পারি। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র এবং আধুনিক মুদ্রণ-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার পূর্ব্বে বিদ্যাসংগ্রহ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। এখন কেউ বই লিখলে, শুধু তার একখানি বা দুখানি হাতেলেখা নকল থাকে না—সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একখানি বই-এর হাজার হাজার কপি ছাপা হয়ে যায়। এবং যে কেউই সামান্য খরচ করে সে বই কিনে পড়তে পারে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হবার পূর্ব্বে যিনি যে-বই লিখতেন তার পুঁথি তাঁর কাছেই থাকত। তিনি যদি মিসরের লোক হতেন, তাহলে মিসরে তাঁর কাছে গিয়ে সেই

পুঁথি পড়ে আসতে হত, কিম্বা যদি তিনি নকল করতে অনুমতি দিতেন, তাহলে নকল করে আনা হত। সেই একখানি পুঁথি হারিয়ে গেলেই, গ্রন্থকারের সমস্ত জ্ঞান-সাধনাও সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যেত। এই ভাবে প্রাচীন জগতের কত জ্ঞান-সাধনা যে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। প্রাচীন জগতের কত বড় বড় গ্রন্থের নাম আর বিবরণই শুধু আমরা জানি, কিন্তু সেই সব গ্রন্থের প্রকৃত বিষয়বস্তু কি ছিল, তা জানবার কোনও উপায় আজ আমাদের নেই। বড় বড় সংস্কৃত বইতে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই যে, গ্রন্থকার তাঁর বহু পূর্ব্ব-আচার্য্য-দের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের নানা গ্রন্থের কথা উত্থাপন করেছেন, কিন্তু সেই সব গ্রন্থ হারিয়ে যাওয়ার দরুণ আজ তাদের বিষয়বস্তু আমাদের কোনও উপকারেই লাগে না। ছাপাখানায় এখন অনায়াসে হাজার হাজার কপি ছাপা যায়, কিন্তু তখন একখানি পুঁথির হয়ত সর্ব্বশুদ্ধ দশখানার বেশী নকলই হত না।

এই জন্যই মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে শিক্ষা গ্রহণ এবং দান খুব সীমাবদ্ধ ছিল। অতি অল্পসংখ্যক লোকই পুঁথির কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারত। আজকাল যতই অর্থ থাক, লেখাপড়া না জানা একটা লজ্জার কথা। কিন্তু পুরাকালের ধনীরা লিখতে বা পড়তে না জানাকে আদৌ লজ্জাকর মনে করতেন না। সেকালের অনেক বড় বড় জমিদার এবং রাজা নিজেদের নাম সই করতে পর্য্যন্ত জানতেন না। তাঁদের হয়ে নাম সই করবার জন্যে তাঁরা মাইনে-করা লোক রাখতেন।

স্বভাবতঃই তাই অতি মুষ্টিমেয় এক শ্রেণীর লোকের উপর গ্রন্থ-রচনার ভার গিয়ে পড়ত। সেই জন্য প্রত্যেক দেশের সাহিত্য এবং সাধনা সেই মুষ্টিমেয় লোকদের দ্বারাই প্রভাবান্বিত হ'ত। তাঁদের যতদূর বিদ্যাবুদ্ধি বা তাঁদের যা প্রবৃত্তি, সেই অনুসারেই তাঁরা লিখতেন এবং অধিকাংশ লোক যেখানে নিরক্ষর সেখানে লিখিত কথার মাহাত্ম্য আপনা থেকেই প্রাধান্য লাভ করত। এই কারণে মধ্যযুগে পাদ্রীদের হাতে পড়ে য়ুরোপে এত ডাইনি আর ভূত-প্রেত বেড়ে উঠেছিল যে, তাদের উৎপাতে গ্যালিলিওকে বৃদ্ধ বয়সে কাঠগড়ায় উঠতে হয়েছিল, ব্রুনোকে পুড়ে মরতে হয়েছিল, জোয়ান অফ আর্ককে চিতায় উঠতে হয়েছিল।

গ্রীস বা রোমের প্রাচীন পুঁথি যা অবশিষ্ট ছিল, তার এক একখানি বই সংগ্রহ করা মানে, একটা সম্পত্তি বিক্রী করার সামিল ছিল। ইতালীর মধ্যযুগের ইতিহাসে এই রকম একটি ঘটনা আছে। ফ্লোরেন্সের এক ভদ্রলোকের বাসনা হয় যে, তিনি কিছু জমি-জমা কিনে বসবাস করবেন। কিন্তু তাঁর অনুরূপ অর্থসঙ্গতি ছিল না। তাঁর কাছে একখানি প্রাচীন বইএর পুঁথি ছিল। একজন বিদেশীকে তিনি সেই পুঁথি বিক্রী করে জমি-জমা কিনলেন। যে-ভদ্রলোকটি সেই পুঁথিখানি কিনলেন, তাঁকেও অর্থসংগ্রহের জন্য তাঁর জমির কিছু অংশ বিক্রী করতে হল। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে বই এমনই দুর্ম্মূল্য ছিল। পাছে হারিয়ে যায় বা কেউ নিয়ে যায়, এইজন্য বড়লোকের বাড়িতে বা গির্জ্জায় বই লোহার শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে রাখা হত।

মুদ্রাযন্ত্র এসে জগতে জ্ঞান-বিতরণের এক নব-যুগ এনে দিল; আধুনিক জগৎ বলতে আমরা যা বুঝি তা এই মুদ্রাযন্ত্রেরই সৃষ্টি। কাগজ, ছাপাবার যন্ত্র আর প্রত্যেক অক্ষরের জন্য ধাতুনির্ম্মিত স্বতন্ত্র টাইপ—এই তিনটি জিনিষকে ভিত্তি করে আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার সমস্ত আয়োজন গড়ে উঠেছে। বৃটিশ মিউজিয়মের জগৎ-খ্যাত রিডিং-রুমে যাতে প্রত্যেক পাঠকের চোখে পড়ে এমনি ভাবে এই অমূল্য কথাগুলি লেখা আছে,—

"Take care of the thing you hold in your hand : it is more precious than gold. Civilization must fall to bits if paper goes.

It is the bridge between barbarism and learning, between anarchy and Government, tyranny and liberty. Without it we should lose the inspiration that stirs the hearts of men and leads them to do great things."

মুদ্রাযন্ত্র এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই সকলের স্মরণে রাখা উচিত—বর্ব্বরতা আর সভ্যতার মধ্যে এরাই হল সেতু।

২

মুদ্রাযন্ত্র কে বা কারা জগতে প্রথম আবিষ্কার করে, পণ্ডিত-মহলে এই নিয়ে নানা বিচার-বিতর্ক আছে। তবে তাঁদের সমস্ত বিচার-বিতর্কের মধ্য হ'তে পাঁচটি সিদ্ধান্ত আমরা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারি—

(ক) চীনারা প্রথম মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার করেন। তবে বর্ত্তমান মুদ্রাযন্ত্র এবং চীনাদের ব্যবহৃত মুদ্রাযন্ত্রের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। তাঁরা কাঠ-খোদাই করে ব্লক তৈরী করতেন— সেই ব্লক থেকে কালির সাহায্যে হাতেচালানো যন্ত্রের চাপে তাঁরা কাগজ ছাপতেন।

(খ) আগে লোকের ধারণা ছিল যে, যে-পদ্ধতি অনুসারে বর্ত্তমান কালে ছাপা হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষরের জন্য স্বতন্ত্র টাইপ ব্যবহার করা—যে-সব টাইপ ইচ্ছা করলে আলাদা আলাদা ভাবে নাড়া চাড়া করা যায়—তা য়ুরোপের সৃষ্টি। কিন্তু বর্ত্তমান ঐতিহাসিকরা প্রমাণ পেয়েছেন যে, একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চীনদেশে এই ধরণের স্বতন্ত্র টাইপ ব্যবহার করে ছাপানোর রীতি প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত টাইপ প্রথম প্রথম মাটীর তৈরী হত। তারপর তাঁরা মাটীর বদলে কাঠ ব্যবহার করতেন এবং তারপরে কাঠের পরিবর্ত্তে তাঁরা টিনের টাইপও ব্যবহার করতেন।

(গ) মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে, প্রাচীন চীনারাই মুদ্রণ ব্যাপারের অপরিহার্য্য অঙ্গ কাগজও প্রথম তৈরী করেন। যিশুখৃষ্টের মৃত্যুর পর ৮০০ বছর পর্য্যন্ত য়ুরোপে এক টুকরো কাগজ ছিল না। ৭৫১ খৃষ্টাব্দে সমরকন্দের আরবী শাসনকর্ত্তা চীনাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে একদল চীনা কাগজ-প্রস্তুত-কারককে বন্দী করে আনেন। সেই বন্দী চীনাদের কাছ থেকে আরবীরা কাগজ তৈরী করার প্রণালী শেখেন। আরবীদের কাছ থেকে য়ুরোপ আবার এই বিদ্যা আয়ত্ত করেন।

(ঘ) পঞ্চদশ শতাব্দীতে জার্ম্মানীর মাইনট্স্ সহরে গুটেনবার্গ সর্ব্বপ্রথম প্রত্যেক অক্ষরের জন্য বিভিন্ন টাইপ ব্যবহার করে বর্ত্তমান মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার করেন।

(ঙ) কেউ কেউ বলেন যে, হলাণ্ডের লরেন্স কষ্টার হ'লেন বর্ত্তমান মুদ্রণ ব্যাপারের আদি-জনক; তাঁরই পদ্ধতি জার্ম্মান গুটেনবার্গ সম্পূর্ণ করে তোলেন। কোলোন ক্রণিকেল (Cologne Chronicle) বলে ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে লেখা একখানি



গুটেনবার্গ



লরেন্স কষ্টার

বই আছে। এই বইখানি হল এই বিষয়ে প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ। মুদ্রা-যন্ত্রের প্রথম আবিষ্কার সম্বন্ধে এই ক্রণিকেলে লেখা আছে—

"Although this art was invented at Mainz, as far as regards the manner in which it is now commonly used, yet the first prefiguration was invented in Holland."

এবং ক্রণিকেলের এই উক্তির প্রমাণে হলাণ্ডবাসীরা তাঁদের দেশের লরেন্স কষ্টারকেই বর্ত্তমান মুদ্রণ-ব্যাপারের আদি-জনক বলে ঘোষণা করে থাকেন।

মোটামুটিভাবে ঐতিহাসিকগণ মুদ্রাযন্ত্রের আদি-আবিষ্কারের কাহিনী সম্বন্ধে যে-সব বিচার-বিতর্কের উত্থাপন করেন, তা থেকে আমরা উপরের এই পাঁচটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

৩

চীনদেশে যিনি সর্ব্বপ্রথম কাঠ-খোদাই করে মুদ্রণরীতি আবিষ্কার করেন, তাঁর নাম ফেঙ্‌ টাও। ফেঙ্‌ টাও চীনের একজন রাজনৈতিক ছিলেন। তিনি ৯৫৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক-গমন করেন। কিন্তু চীনা ঐতিহাসিকরা বলেন যে ফেঙ্‌ টাও জন্মগ্রহণ করবার প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে চীনে মুদ্রণের কাজ আরম্ভ হয়।

জগৎ-বিখ্যাত আবিষ্কারক এবং ঐতিহাসিক স্যর অরেল ষ্টাইন মধ্য-এশিয়ার মরুভূমির তলদেশে বিলুপ্ত সভ্যতার অনুসন্ধান করতে গিয়ে মাটির তলা থেকে কতকগুলি মুদ্রিত চীনা কাগজ পান। সৌভাগ্যের বিষয় তার মধ্যে চারটি কাগজে তারিখ দেওয়া আছে। তার মধ্যে যেটির তারিখ সব চেয়ে

প্রাচীন, সেটি হচ্ছে ৮৬৮ খৃষ্টাব্দের। ষোল ফিট লম্বা একটা কাগজ—তাতে বৌদ্ধধর্ম্মের কতকগুলি মন্ত্র ছাপান। সেই কাগজটিতে একটি ছবিও মুদ্রিত আছে। ছবির নিখুঁত মুদ্রণ দেখে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, এই বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জ্জন করতে অন্ততঃ আরও এক শতাব্দী কাল যে লেগেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

জাপানের প্রাচীন ইতিহাসে এক জায়গায় এক বিবরণে লেখা আছে যে, ৭৭০ খৃষ্টাব্দে চীন থেকে দশলক্ষ মুদ্রিত মন্ত্র জাপানে আসে। এই সব মন্ত্র ছোট ছোট কাগজে মুদ্রিত হত। এবং ঐ সময়কার এই ধরণের মন্ত্র-লেখা মুদ্রিত একখানি কাগজ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তা বৃটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত সেইটিই হল প্রথম মুদ্রিত কাগজ।

৪

হারলেম্ বলে হলাণ্ডে খুব প্রাচীন একটি শহর আছে। দেখলেই মনে হয় খুব প্রাচীন শহর, সেই জন্য ইংরাজীতেও এই শহর সম্বন্ধে প্রায়ই বলা হয়, the sleepy old town of Haarlem.

এই সুপ্রাচীন শহরে প্রায় ছ'শো বছর আগে লরেন্স কষ্টার নামে এক বৃদ্ধ বাস করতেন। যৌবনে তাঁর নিজের একটি সরাইখানা ছিল, কিন্তু বৃদ্ধবয়সে তিনি গ্রামের গির্জ্জার তদারক করে জীবিকা অর্জ্জন করতেন। গির্জ্জার গ্রন্থাগারে যে-সব

পুরাতন পুঁথি সংগৃহীত ছিল, তাই পড়ে তিনি অবসর বিনোদন করতেন।

তাঁর তিনটি ছোট ছোট নাতনী ছিল। তিনি তাদের সেই সব পুঁথির গল্প বলতেন। তাদের লেখাপড়া শেখাবার তাঁর বড়ই বাসনা হয়, কিন্তু বই কোথায় পাবেন? রাস্তায় বেড়াবার সময় দোকানে দোকানে যে-সব সাইন বোর্ড লেখা থাকত তাই দেখিয়ে তিনি তাদের অক্ষর পরিচয় করাতে লাগলেন। মাঝে মাঝে কবরখানায় নিয়ে গিয়ে কবরের স্মৃতি-ফলকে যে-সব লেখা থাকত, তাই দেখিয়ে তিনি তাদের অক্ষর পরিচয় করাতেন। বাড়ীতে পোড়া কাঠ দিয়ে সেই সব লিখে আবার তাদের দেখাতেন।

একদিন বাগানে বসে, খেলার ছলে তিনি গাছের ছাল কেটে কেটে এক একটা অক্ষর তৈরী করছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল যে, এই ভাবে গাছের ছাল কেটে তিনি সব অক্ষরগুলিই তো তৈরী করতে পারেন।

নাতনীদের কিছু না বলে গোপনে তিনি গাছের ছাল কেটে সমস্ত অক্ষর তৈরী করে একটা পার্চ্চমেণ্ট কাগজে মুড়ে বাড়ী নিয়ে এলেন। বাড়ী এসে কাগজ খুলতেই দেখেন, পার্চ্চমেণ্টের গায়ে কাঁচা ছালের রসে এক একটা অক্ষরের স্পষ্ট ছাপ বসে গিয়েছে, তবে মজার ব্যাপার যে অক্ষরগুলোর উল্টো ছাপ পড়েছে।

সেই থেকে কষ্টারের মনে হল যে, গাছের ছালে অক্ষর তৈরী করবার সময় যদি তিনি উল্টো করে লেখেন, তা হলে

তার ছাপ যখন পড়বে, তখন অক্ষরগুলো নিশ্চয়ই সব সোজা দেখাবে। পরীক্ষা করে দেখলেন যে সত্যই তাই।

তখন তিনি মতলব করে কাঠের উপরে উল্টো করে এক একটা অক্ষর উঁচু করে খোদাই করতে লাগলেন এবং তার ছাপ নিয়ে দেখলেন, বেশ স্পষ্ট সব অক্ষর ফুটে উঠেছে।

খেলতে খেলতে এই ভাবে হঠাৎ একদিন লরেন্স কষ্টার টাইপ তৈরী করবার পথ খুঁজে পেলেন। সেই দিন থেকেই, প্রত্যেক অক্ষরের জন্য স্বতন্ত্র টাইপ তৈরী করে, হাতে-লেখার বদলে ছাপার অক্ষরে বই নকল করার পথও মানুষ খুঁজে পেল।

৫

সেই সময় জার্ম্মানীতে গুটেনবার্গ বলে একজন লোক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁকে বর্ত্তমান মুদ্রা-যন্ত্র এবং মুদ্রণ-পদ্ধতির আদি-জনক বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, তাঁর সঙ্গে লরেন্স কষ্টারের দেখা হয়েছিল এবং লরেন্স কষ্টারের নিকটই তিনি টাইপ তৈরী করে ছাপাবার পদ্ধতি শেখেন; কেউ কেউ বলেন যে, তিনি আপনা থেকেই এই মুদ্রণ-বিদ্যার বিভিন্ন অঙ্গের উদ্ভাবনা করেন। তবে এ-কথা ঠিক যে, য়ুরোপে তিনিই প্রথম ধাতুনির্ম্মিত টাইপ ব্যবহার করে বই ছাপান।

১৯০০ সালে সমগ্র জার্ম্মানী তাঁর জন্মের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিরাট উৎসবের আয়োজন করে। পাঁচশো বছর আগে ১৪০০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানীর মাইন্‌ট্‌স্ শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর মার নাম অনুসারে তাঁর নাম গুটেনবার্গ হয়। যৌবনে তিনি আয়না তৈরী করার ব্যবসায় করতেন, তাতে তাঁর বেশ দু'পয়সা আসতে থাকে। সেই সময় আয়্-লা-শাপেল্ শহরে বিরাট এক মেলা হয়। সেই মেলায় বিক্রী করবার জন্যে তিনি আগে থাকতে অনেক আয়না তৈরী করেন, কিন্তু ভাগ্য-ক্রমে মেলায় যাওয়া তাঁর ঘটে ওঠেনি এবং তার ফলে সমস্ত আয়না ঘরে জমা হয়ে থাকে। এ ব্যবসা তাঁকে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধ করে দিতে হয়।



জন ফাউষ্ট



আলডুস্ মান্থটিয়াস্

তাঁর এই সময়ের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবর আমাদের জানা নেই। শুধু এইটুকু খবর পাওয়া যায় যে তিনি মাঝে মাঝে টাকা ধার করতেন এবং গোপনে কি সব বিষয়ে পরীক্ষা করতেন। এই সময়েই তিনি টাইপের সাহায্যে মুদ্রণ-কার্য্য

সম্পাদন করবার অভিনব পন্থা সম্বন্ধে গোপনে পরীক্ষার পর পরীক্ষা করতে থাকেন। পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়ে তিনি তাঁর জন্ম-নগরে ফিরে গেলেন। স্থির করলেন যে, সেইখান থেকেই তিনি এই অভিনব ব্যবসায় আরম্ভ করবেন।

কিন্তু ছাপার কল, টাইপ ইত্যাদি তৈরী করবার মতন অর্থ-সঙ্গতি তাঁর ছিল না। জন ফাউষ্ট বলে একজন সুচতুর স্বর্ণ-কারের কাছে তিনি টাকা ধার পেলেন এই সর্ত্তে যে, টাকা শোধ দিতে না পারলে, ব্যবসায়-সংক্রান্ত সমস্ত জিনিষ-পত্র জন ফাউষ্টের হয়ে যাবে এবং ব্যবসায়ের লাভের অর্দ্ধেক অংশ তিনি পাবেন।

গুটেনবার্গ নিজে ধাতুর কাজ ভাল রকম জানতেন না। অনুসন্ধানের পর তিনি পিটার স্কফার বলে একজন কারিকরকে পেলেন। ধাতুর কাজে তিনি ওস্তাদ ছিলেন। স্কফারের সাহায্যে তিনি ছাঁচ তৈরী করে ধাতুনির্ম্মিত টাইপ তৈরী করালেন।

টাইপ এবং ছাপার কল তৈরী করে গুটেনবার্গ স্থির করলেন যে, প্রথম যে বই তিনি ছাপাবেন, তা হল বাইবেল। ল্যাটিন ভাষায় সেই বাইবেল হল য়ুরোপের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। বিশেষজ্ঞরা সেই বইএর ছাপা সম্বন্ধে বলেন যে, "য়ুরোপের সেই প্রথম মুদ্রিত বই, ছাপানো বই হিসাবে, আজও পর্য্যন্ত ছাপানো বই-এর একটি উৎকৃষ্টতম নমুনা।"

এই বাইবেলের মাত্র আটত্রিশ খানি নাকি এখন জগতে বর্ত্তমান আছে। যাঁরা পুরাতন বই সংগ্রহ করেন তাঁদের কাছে

গুটেনবার্গের ছাপা এই বাইবেল এক মহা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গুটেনবার্গের একখানি বাইবেল ৩৯০০ পাউণ্ডে বিক্রীত হয়।

এইভাবে য়ুরোপে প্রথম ছাপাখানা দেখা দিল। কিন্তু নানা প্রাথমিক খরচের জন্যে প্রথম প্রথম এই ছাপাখানা থেকে বিশেষ কোনও লাভ হত না। অথচ তখন টাকার দরকার। ধূর্ত্ত ফাউষ্ট এই সময় মতলব করলেন যে, বার বার তাঁকেই যখন টাকা দিতে হচ্ছে, তখন তিনি কেন অর্দ্ধেক অংশীদার হয়ে থাকেন! ইচ্ছে করলে তো সমস্ত ছাপাখানাটাই তিনি দখল করে নিতে পারেন!

ফাউষ্ট জানতেন যে, তিনি যে টাকা ধার দিয়েছেন, তা ফিরে চাইলে, গুটেনবার্গ এখন দিতে পারবেন না। কালবিলম্ব না করে ফাউষ্ট গুটেনবার্গের কাছে তাঁর সমস্ত টাকা ফেরত চাইলেন। গুটেনবার্গ টাকা পাবেন কোথায়?

ফাউষ্ট আদালতে নালিশ করে, ঋণের সর্ত্ত অনুযায়ী গুটেন-বার্গের সমস্ত ছাপাখানা দখল করে নিলেন।

জীবনের শেষ লগ্নে, সমস্ত বাধা-বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করে, গুটেনবার্গ যখন জগতে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করবার জন্য তৈরী হলেন, ঠিক সেই সময়ই ভাগ্যের বিড়ম্বনায় একেবারে নিঃস্ব হয়ে তাঁকে পথে দাঁড়াতে হল।

এত দিনের সাধনার ফল পরহস্তগত হওয়ায়, গুটেনবার্গ ভেঙ্গে পড়লেন বটে কিন্তু আশা ছেড়ে দিলেন না। ডাঃ হোমারী বলে একজন লোক নূতন প্রেস করবার জন্য তাঁকে কিছু টাকা

ধার দিলেন। কিন্তু সেই অল্প টাকায় তিনি আর বিশেষ কিছু করে উঠতে পারলেন না। প্রতিদিন তাঁর অবস্থা শোচনীয়তর হয়ে উঠতে লাগল। শেষকালে অবস্থা এরকম দাঁড়াল যে মাইন্‌ট্‌স্‌-এর ধনী আর্কবিশপ তাঁকে মাসে মাসে কিছু টাকা পেন্‌সন্‌ স্বরূপ দিতেন। তাতেই কোন রকমে তাঁর দিন চলে যেত। তবে সংসারের বোঝা তাঁর বেশী ছিল না, কারণ তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

১৪৬৮ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী যখন তিনি দেহত্যাগ করলেন, তখন তাঁর মৃত্যুশয্যায় কেউ-ই উপস্থিত ছিল না। একান্ত বন্ধুহীন অবস্থায় নীরবে নিতান্ত অপরিচিতের মত তাঁকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়।

এই ঘটনার প্রায় চারশো বছর পরে মাইন্‌ট্‌স্‌ শহরে সমগ্র জার্ম্মান জাতি সমবেত হয়ে তাঁর বিরাট এক প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু তখন গুটেনবার্গের নাম জার্ম্মানীর মাইন্‌ট্‌স্‌ শহরের সীমানা ত্যাগ করে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।

৬

নিতান্ত অবজ্ঞাত এবং অপরিচিত অবস্থায় গুটেনবার্গকে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হল বটে, কিন্তু তিনি যে-যন্ত্র সেদিন তাঁর জন্ম-নগরীতে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, দেখতে দেখতে জার্ম্মানীর প্রত্যেক প্রধান নগরে, জর্ম্মানীর সীমানা ছাড়িয়ে য়ুরোপের প্রত্যেক দেশে, তা ছড়িয়ে পড়ল। এত দিনের জমাটবাঁধা অন্ধকারের মধ্যে যেন এক নিমেষে সূর্য্য জেগে উঠল।

চারিদিকের অন্ধকার দূর হয়ে যেতে লাগল। যা ছিল দুর্লভ, তা হয়ে উঠল সহজ ও সুলভ। সাধারণ মানুষের ঘরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা এসে পেঁছিল।

য়ুরোপের কোন্ দেশে কোন্ সময় প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, নীচে তার তালিকা দেওয়া হল—

জার্ম্মানী	...	১৪৫৪ খৃষ্টাব্দ
ইতালী	...	১৪৬৫ "
সুইট্জারল্যাণ্ড	...	১৪৬৮ "
ফ্রান্স	...	১৪৭০ "
হলাণ্ড	...	১৪৭৩ "
বেলজিয়াম ও অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরী	...	১৪৭৩ "
স্পেন	...	১৪৭৪ "
ইংলণ্ড	...	১৪৭৭ "
ডেনমার্ক	...	১৪৮২ "
সুইডেন	...	১৪৮৩ "
পর্ত্তুগাল	...	১৪৮৭ "

মেক্সিকোবাসী একজন স্পানিয়ার্ডের চেষ্টায় আমেরিকায় প্রথম ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকায় ইংরেজী ভাষায় প্রথম বই ছাপান হয় ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে হার্ভার্ড কলেজ থেকে। এই হার্ভার্ড কলেজই এখনকার বিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

মুদ্রাযন্ত্রের গোড়ার দিকে যে কয়েকজন লোক এই অভিনব

আবিষ্কারকে মানবের জ্ঞানবৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত করেন তাঁদের মধ্যে ইতালীর জেন্‌সন্ এবং ইংলণ্ডের ক্যাক্‌স্‌টনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আজ ছাপার অক্ষরের মধ্য দিয়ে এক দেশ আর এক দেশকে জানছে, ছাপার অক্ষরের মধ্য দিয়েই অতীত এবং বর্ত্তমানের যোগসূত্র বজায় থাকছে। জেন্‌সন্ ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে ভিনিস্ শহরে ছাপাখানা করেন। ছাপাখানা তৈরী করবার তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে রক্ষা করা। সেদিন জেন্‌সন্ যদি তৎপর না হতেন, তাহলে গ্রীস ও রোমের বহু প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থ, যা আমরা আজ অতি সামান্য খরচে ঘরে বসে পড়তে পাই, তাদের দেখাও পেতাম না। অন্য বহু বিলুপ্ত পুঁথির মত তারাও হয়ত বিলুপ্ত হয়ে যেত। অতীত কালের সাধনাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যই জেন্‌সন্ ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। পুঁথির লেখার আর একটা বিপদ আছে। প্রত্যেক বার নকল করার সঙ্গে সঙ্গে পুঁথি-লেখকের ইচ্ছানুযায়ী অনেক সময় মূল লেখার অদলবদল হয়ে যায়। মূল বইতে যে-সব কথা থাকে না, এমন সব কথা বা কাহিনী ধীরে ধীরে পুঁথিতে ঢুকে যায়। এই ভাবে শত শত বছর চলে আসার পর আসল পুঁথি এইভাবে বিকৃত হয়ে পড়ে। জেন্‌সন্ স্থির করলেন যে, যে-সব পুঁথি এখনও পাওয়া যায়, তার বিভিন্ন পুঁথি মিলিয়ে পাঠোদ্ধার করা প্রয়োজন। আজকাল প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের যে-সব সুপ্রাচীন গ্রন্থ আমরা পড়ি, তার অধিকাংশ পাঠই জেন্‌সনের নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া। তাঁর এই মহৎ কাজের জন্য তিনি

কাউণ্ট পালাটিন উপাধি পান। পুস্তক-প্রকাশকের পক্ষে রাজ-সম্মান জগতে সেই প্রথম।

জেন্‌সন্ যে-কাজের সূত্রপাত করে দিয়ে গেলেন, তাঁর মৃত্যুর পর আল্‌ডুস্ মানুটিয়াস্ তাকে আরও ব্যাপকভাবে সার্থক করে তুললেন। তিনি সেই সময়কার একজন বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত ছিলেন। প্রাচীন গ্রীসের সাধনাকে সংরক্ষণ করবার জন্যে জেন্‌সনের মত তিনিও জীবনপণ করেন। আজকাল ইংরেজী বইতে আঁকাবাঁকা যে-ধরণের অক্ষর আমরা দেখতে পাই, যাকে ইংরেজীতে 'ইটালিক্' টাইপ বলে, তা আলডুসেরই সৃষ্টি।

ইংলণ্ডে উইলিয়াম ক্যাক্‌স্‌টন্ প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। অনুমান ১৪২২ খৃষ্টাব্দে তিনি কেণ্ট প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভেই ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য তিনি বেলজিয়ামের ব্রুজেস্ শহরে গিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করেন, এবং সেই শহরে তিনি ত্রিশ বছর ধরে বাস করেন। এই ত্রিশ বছরের মধ্যে ব্যবসায়ে তিনি এতদূর প্রতিপত্তি লাভ করেন যে, চতুর্থ এডওয়ার্ড তাঁকে ঐ অঞ্চলের বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারের রাজদূত মনোনীত করেন।

১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে কোলার্ড ম্যান্‌সিয়ন্ বলে একজন লোক ব্রুজেস্ শহরে একটা ছাপাখানা খোলেন। ক্যাক্‌স্‌টন্ কাজকর্ম্মের অবসরে প্রায়ই কোলার্ডের ছাপাখানায় বেড়াতে যেতেন। এটা-ওটা সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করতেন। এই ভাবে প্রথম প্রথম সময় কাটাবার জন্যেই তিনি ম্যান্‌সিয়নের ছাপাখানায় যাতায়াত করতেন। কিন্তু এইভাবে

যাতায়াত করতে করতে ছাপাখানার কাজ তিনি বুঝে নিতে লাগলেন।

অবসর সময়ে তিনি মাঝে মাঝে সাহিত্যচর্চ্চা করতেন। এইভাবে তিনি ফরাসী ভাষা থেকে ট্রয়ের ইতিহাস অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদখানিকে ছাপাবার তাঁর বাসনা হয় এবং কোলার্ডের প্রেস থেকেই তিনি বইখানি ছাপান। ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত সেই হল প্রথম বই। তারপর The game and playe of chesse বলে সতরঞ্চ খেলার আর একখানি বই ফরাসী ভাষা থেকে অনুবাদ করেন। সেখানিও কোলার্ডের প্রেসে ছাপা হয়।

১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে ক্যাক্স্টন ব্রুজেস্ ত্যাগ করে লণ্ডনে ফিরে এলেন। স্থির করলেন, লণ্ডনে তিনি নিজেই ছাপাখানা খুলবেন। ওয়েষ্টমিনিষ্টারে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করে ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি "The Dictes and Sayings of the Philosophers" বলে একখানি বই মুদ্রিত করলেন। ইংরেজী ভাষায় ইংলণ্ডে মুদ্রিত সেই হল প্রথম বই।

অবশ্য ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দের আগে অর্থাৎ ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে (যে বছরে প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়) ক্যাক্স্টনের ছাপাখানা থেকে সামান্য সামান্য ছাপার কাজ হয়েছিল।

জেন্সন্ এবং মানুটিয়াস্ গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্য সম্বন্ধে যা করেছিলেন, ক্যাক্স্টন ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে ঠিক তাই কর্তে লাগলেন। যে-সাহিত্য এবং ভাষা এত দিন বিদেশী নরম্যানদের প্রভাবে অবজ্ঞাত হয়ে পড়েছিল,

সেই ভাষা এবং সাহিত্যকে তিনি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করবার ভার নিলেন। পুঁথির দাম এত বেশী ছিল যে, জনসাধারণ পুঁথির কাছে পৌঁছতে পারত না। যে বছরে জার্ম্মানীতে গুটেনবার্গ জন্মগ্রহণ করেন, ঠিক সেই বছরে ইংরেজী ভাষার প্রথম মহাকবি চসার দেহত্যাগ করেন। তখন ইংলণ্ডের শিক্ষিত লোকেরা ফরাসী ভাষায় লেখাপড়ার কাজ করতেন, কারণ রাজ-দরবারে তখন ফরাসীদেরই প্রাধান্য ছিল। দেশের লোকের মুখের ভাষা অবজ্ঞাত অবস্থায় পড়ে ছিল। চসার এসে ইংরেজী ভাষার সেই হীন অবস্থা দূর করবার জন্য দেশের ভাষাতেই দেশের জনসাধারণের জন্যে কাব্য লিখলেন। কিন্তু তখন ছাপাখানা ছিল না। চসার এবং তাঁর সময়কার ইংরেজী সাহিত্যিকদের লেখা পুঁথিতে প্রচলিত ছিল। ক্যাক্স্টন এসে চসারের সাধনাকে ইংলণ্ডের জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিলেন। এইখানেই ক্যাক্স্টনের মহত্ত্ব। তাঁর প্রেস থেকে তিনি চসারের "Canterbury Tales", ম্যালোরীর "Le morte de Arthur" ছাপালেন।

ইংরাজী সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবার জন্য তিনি বিদেশের সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সব গ্রন্থ অনুবাদ করতে লাগলেন। ইংলণ্ডের তিনিই প্রথম অনুবাদক এবং জগতের অনুবাদ-সাহিত্যে তাঁর নাম অমর হয়ে আছে। মুদ্রণ ব্যাপারের বিখ্যাত ইতিহাসলেখক D. B. Updike ক্যাক্স্টন্ সম্বন্ধে বলেছেন,

"His services to literature in general and particularly to English literature, as a translator and publisher, would have made him a commanding figure if he had never printed a single page."

জগতের এই সব প্রথম মুদ্রাকর এবং পুস্তক-প্রকাশকদের জীবন থেকে আমরা দেখতে পাই যে, সাহিত্যের উন্নতির এবং শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁদের কতখানি ঘনিষ্ঠ যোগ। জেন্‌সন্, মানুটিয়াস্, ক্যাক্‌স্‌টন্ প্রভৃতির দ্বারাই গ্রীক, ল্যাটিন এবং ইংরেজী সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছাপাখানাকে যখন মানুষ শুধু ছু'পয়সা রোজগার করবার জন্য অপব্যবহার করে, তখন এই সব আদি পুস্তক-প্রকাশকদের কথা মনে পড়ে। আমাদের দেশে যাঁরা ছাপাখানার মালিক, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাপাখানার এই বিরাট দায়িত্ব এবং সৃজনীশক্তির কথা জানেন না, অথবা জানলেও পয়সার মোহে তাঁরা মানব-সভ্যতার এই মহা কল্যাণকর সৃষ্টিকে শুধু পয়সা রোজগারের কলস্বরূপই ব্যবহার করেন।

ক্যাক্‌স্‌টন্ জীবদ্দশায় বিপুল সম্মান লাভ করেন। রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ড তাঁর প্রেসে এসে তাঁর ছাপার কাজ দেখতেন। চতুর্থ এড্‌ওয়ার্ডের পর তৃতীয় রিচার্ডও তাঁকে প্রভূত সম্মান দেখিয়েছিলেন।

কোন্ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন, তার সঠিক খবর জানা যায় না। ওয়েষ্টমিনিষ্টারের সেণ্ট মারগারেট গির্জ্জার পুরাতন

দফ্‌তরে শুধু এক যায়গায় খরচ লেখার পাতায় লেখা আছে যে, উইলিয়াম ক্যাক্‌স্‌টনের মৃতদেহ সমাধির উপলক্ষে মশাল কেনার দরুণ ৬ শিলিং ৮ পেন্স, এবং ঘণ্টা বাজানোর দরুণ ৬ পেন্স খরচ হল।

তারপর মানুষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যতই অগ্রসর হতে লাগল, প্রেসের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও সেই সঙ্গে বদলাতে লাগল। আজকাল রোটারী মেশিন থেকে ঘণ্টায় ১ লক্ষ ২০ হাজার কাগজ ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে। এই মুদ্রাযন্ত্রের গঠন এবং বিচিত্র উদ্ভাবনী কৌশল বর্ত্তমান জগতের অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার অন্যতম প্রধান বিস্ময়।



আজকাল ছায়াচিত্র সমগ্র জগতে তার আসন করে নিয়েছে। শুধু মানুষকে আনন্দ দেওয়ার কাজে নয়, মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি এবং শিক্ষাপ্রচারের কাজে বিজ্ঞানের এই নবতম দান এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকার সঙ্গেও এই শিল্পের অতি ঘনিষ্ঠ যোগ।

এই সিনেমা-যন্ত্রের প্রথম আবিষ্কর্তা কে ?

অনেকেই বলবেন যে, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এক কথায় সম্ভব নয়। কারণ, বহুলোকের বহুদিনের সাধনায় এই শিল্প খণ্ডখণ্ড ভাবে জন্মগ্রহণ করেছে। তাই কোন একজন লোককে এই সম্মানের জন্য চিহ্নিত করে রাখা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানের বহু সৃষ্টি সম্বন্ধে এই একই কথা বলা যায়।

বেতার-বিজ্ঞানও কোন একজন বৈজ্ঞানিকের সৃষ্টি নয়। তবুও মার্কনীর নাম বেতার সম্পর্কে আমরা প্রথমেই উচ্চারণ করি। কারণ, তিনিই পূর্ব্ববর্ত্তীদের সমস্ত সিদ্ধান্ত কাজে লাগিয়ে সর্ব্বপ্রথম ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বেতার-যন্ত্রের পেটেণ্ট গ্রহণ করেন।

সিনেমা-যন্ত্রের পেটেণ্ট কে গ্রহণ করেন ?

এই নিয়ে য়ুরোপ ও আমেরিকার মধ্যে গত যুগে নানা বচসা হয়ে গিয়েছে। শেষকালে এই ব্যাপারের মীমাংসার জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি মিষ্টার হোয়াইটের কাছে আবেদন করা হয়। জনমত ঘোষণা করে যে, জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসনই সিনেমা-যন্ত্রের আদি প্রবর্ত্তক। বিচারপতি হোয়াইট নথীপত্র ঘেঁটে দেখেন, তা সত্যি নয়। এবং আমেরিকার প্রধান বিচারপতির আসন থেকে তিনি ঘোষণা করেন যে, এডিসনের পূর্ব্বে ফ্রিজ্ গ্রীণ বলে একজন লোক এই যন্ত্রের পেটেণ্ট গ্রহণ করেন এবং তাঁকেই সিনেমা-যন্ত্রের আদি-প্রবর্ত্তক বলা উচিত।

আদালতের বিচারে ফ্রিজ্ গ্রীণ সিনেমা-যন্ত্রের আদি প্রবর্ত্তক হলেন বটে, কিন্তু আজ জগতে কে তাঁর নাম জানে ? সিনেমার ইতিহাসের বইতেও তাঁর নাম বহু ক্লেশে খুঁজে বার করতে হয়, কিন্তু এডিসনের নাম সিনেমা-যন্ত্রের সঙ্গে সকলের মুখে মুখে আজও ঘুরছে। তার কারণ কি ?

এডিসন জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করেছিলেন। জনতা জয়ী পুরুষেরই বাহন। ফ্রিজ্ গ্রীণ জীবন-সংগ্রামে পরাজিত

হয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত সৈনিককে যেমন চলমান সেনাদল পদদলিত করে যায়, জীবনে যারা পরাজিত হয়, জনতা তাদের তেমনি করেই পদদলিত করে চলে যায়। কার বুকে পা দিয়ে তারা চলেছে,—পাথর, কাদা না মানুষেরই মৃতদেহ—তা দেখবার বিলাসিতা জনতার নেই।

সিনেমা-যন্ত্রের আদিপ্রবর্ত্তক হতভাগ্য ফ্রিজ্ গ্রীণের স্মৃতি উন্মাদ জনতার পায়ের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে, তাতে অবশ্য ফ্রিজ্ গ্রীণের মর্য্যাদাহানি হয়নি, কারণ উন্মাদ জনতা দেবতার প্রসাদী ফুলও সমান উৎসাহে মাড়িয়ে চলে যায়।

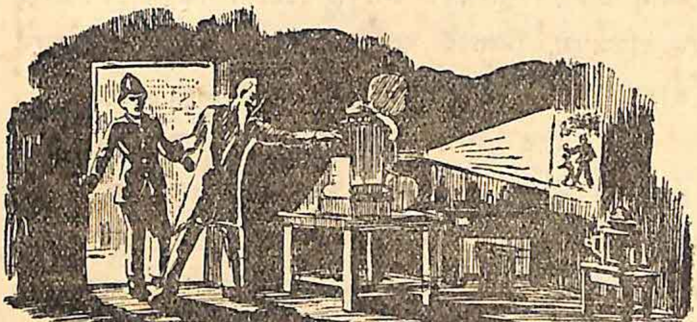
সিনেমা-যন্ত্রের আদিম-ইতিহাসের কথা এখানে আজ বলতে চাই না। আজ শুধু ফ্রিজ্ গ্রীণের কথাই বলব।

ফটোগ্রাফী আর ছায়াচিত্রের মধ্যে প্রধান তফাৎ হল,—ফটোগ্রাফ নড়ে না, ছায়াচিত্র নড়ে। ছবিকে নড়াবার জন্যে বহু লোক বহু দেশে চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের আগে কেউ-ই সফল হতে পারেন নি। সেই বছরে ফ্রিজ্ গ্রীণ সর্ব্বপ্রথম একটি যন্ত্র তৈরী করলেন যার সাহায্যে ফটোগ্রাফ নড়ে উঠল। গ্রেট বৃটেনের সুবিখ্যাত ফটোগ্রাফিক সোসাইটিতে ফ্রিজ্ গ্রীণ সেই ছবি দেখালেন। সামান্য ছবি—শুধু একটা মুখ হাসছে আর চোখ মিট্‌মিট্ করছে।

তখন তিনি নতুন নেগেটিভ তৈরী করার দিকে দৃষ্টি দিলেন। দুধারে ছেঁদা কাটা সেলুলয়েডের ফিল্মের পেটেন্ট তিনিই প্রথম গ্রহণ করেন। সেটা হল ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১০ই

মে। সেইদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত সিনেমা-শিল্প সম্বন্ধে যত আবিষ্কার হয়েছে সব যদি সহসা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তা হলে দেখা যাবে যে, ফ্রিজ্ গ্রীণ জগতের প্রথম ক্যামেরা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁর ক্যামেরায় সিনেমার প্রথম সেলুলয়েড ফিল্ম্ জড়ান রয়েছে।

১৮৮৮ সালে, তখন ফ্রিজ্ গ্রীণের তেত্রিশ বছর বয়স (কারণ তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিষ্টলে জন্মগ্রহণ করেন), তিনি হাইডপার্কের এক কোণে দাঁড়িয়ে আপনার মনে নিজের ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতেন। উদাসীন জনতা দু'দিক দিয়ে চলে যেত। এইখানেই ১৮৯০ সালের জানুয়ারী মাসে জগতের



ক্যামেরার কাছে ফ্রিজ্ গ্রীণ, আর তার একটু দূরে
সেই নামহীন পুলিশ

প্রথম চলচ্চিত্রের 'শট্' নেওয়া হয়—ক্যামেরাম্যান ফ্রিজ্ গ্রীণ, অভিনেতা হাইডপার্কের পরিভ্রমণকারীর দল।

প্রতিদিন হাইডপার্কের কোণে দাঁড়িয়ে গ্রীণ তাঁর ক্যামেরা নিয়ে পরীক্ষা করতেন। রাত্রিতে তাঁর ছোট ল্যাবরেটরীতে গিয়ে দেখতেন, সত্যই ছবি নড়ে উঠল কি-না। যেদিন সহসা তিনি দেখলেন যে, ছবি নড়ে উঠেছে, হাইডপার্কের জনতা তাঁর ঘরের পর্দ্দার উপর দিয়ে চলে গেল, তিনি উন্মাদ হয়ে রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে পড়লেন। আর্কিমিডিসের মত তিনিও চীৎকার করে উঠেছিলেন, পেয়েছি, পেয়েছি!

সামনেই একজন পুলিশ-সার্জ্জেণ্টের দেখা পেলেন। কোনও কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে তিনি হাত ধরে সেই পুলিশকেই বাড়ীতে টেনে নিয়ে এলেন। কাউকে তো দেখান চাই! পুলিশের লোকটি তো অবাক্! সে প্রথমে ভেবেছিল যে, নিশ্চয়ই বহুদিনের কোনও পুরোগো চোরকে লোকটা খুঁজে পেয়েছে, তাই তাকে ডেকে নিয়ে চলেছে।

ছোট্ট ঘরে স্তম্ভিত বিস্ময়ে দুটি লোক দাঁড়িয়ে। ক্যামেরার কাছে ফ্রিজ্ গ্রীণ, আর তাঁর একটু দূরে সেই নামহীন পুলিশ। সামনে অন্ধকার ঘরে ছোট্ট একটু সাদা পর্দ্দা। জগতের সেই প্রথম বায়োস্কোপ। দর্শক—শুধু একজন নামহীন পুলিশ। জগতের প্রথম ছায়াচিত্রের সেই প্রথম দর্শক।

দক্ষিণ কেন্‌সিংটনের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিউজিয়ামে সেই সেলুলয়েডের ফিল্‌ম্-টুক্‌রো অতি যত্নের সঙ্গে সংরক্ষিত আছে। পেটেণ্ট-বিচারের দিন এই সেলুলয়েডের টুক্‌রোটুকু বহু বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা ক'রে দেখে প্রকাশ্য আদালতে মত

দিয়েছিলেন যে, ছায়া-চিত্রের জন্যে সেলুলয়েড ফিল্‌ম্ ব্যবহার করার ব্যাপারে ফ্রিজ্ গ্রীণই জগতে সর্ব্বপ্রথমের সম্মান দাবী করতে পারেন।

সময়ের আগে আসার দরুণ বহু প্রতিভাকে শাস্তি পেতে হয়েছে। আজকে যে জিনিষের সার্থকতা স্কুলের ছেলেও বুঝতে পারে, এমন অনেক উদাহরণ দেখাতে পারা যায় যে, যখন প্রথম সেই সব জিনিষ আবিষ্কার করা হয়, তখন বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরাও ঠাট্টা করেছেন। ওয়াটার্‌লুর যুদ্ধের আগে ফুলটন নেপোলিয়ানের সঙ্গে দেখা করে বল্লেন, তিনি বাষ্প-চালিত জাহাজ তৈরী করে দেবেন। তা হলে সমুদ্রে তিনি অনায়াসে বৃটিশদের পরাস্ত করতে পারবেন। বাষ্প-চালিত জাহাজের কথা শুনে নেপোলিয়ানের মত লোকও হেসেছিলেন এবং তিনি ফুলটনকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ফুলটন তার কয়েক বছর পরে আমেরিকায় গিয়ে বাষ্প-চালিত জাহাজ তৈরী করলেন। সে-দিন নেপোলিয়ান যদি ফুলটনের পরামর্শ শুন্‌তেন, তা হলে হয়ত য়ুরোপের মানচিত্র বদলে যেত! এমনি বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেখানে সময়ের আগে আসার দরুণ প্রতিভাকে বাধা পেয়ে ফিরে যেতে হয়েছে।

ফ্রিজ্ গ্রীণের চরম দুর্ভাগ্য যে তিনি তাঁর সময়ের আগে এসেছিলেন। এবং তার ওপর তিনি জানতেন না, কি করে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে হয়। বহু চেষ্টা-চরিত্র করে টাউন হলে তিনি তাঁর ছবি প্রকাশ্যভাবে দেখালেন। ন' দিন ধরে লোকের কিছু কিছু ভিড় হল।

ছবি নড়ে নড়ে চলেছে। তাতে কার কি?

ন'দিনের উৎসাহ দেখতে দেখতে নিবে গেল। জনতা ফ্রিজ্ গ্রীণের নামই ভুলে গেল। আজ আমাদের মনে হতে পারে যে, ছায়াচিত্রে কি অঘটনই না ঘটেছে, কিন্তু সেদিন ছবিকে নড়তে দেখে কারুরই মনে ছায়াছিত্রের বিরাট সম্ভাবনার কথা জাগে নি। কিম্বা এ-ও হতে পারে যে, যাদের জাগতে পারতো, ফ্রিজ্ গ্রীণ তাদের কাছে পৌঁছতে পারেন নি। টাউন হলের প্রদর্শনী যদি কোনও দুঃসাহসী কল্পনা-প্রবণ ব্যবসায়ীর চোখে সেদিন পড়ত, তা হলে ফ্রিজ্ গ্রীণের জীবনকথা অন্য সুরে লিখতে হর্ত।

ফ্রিজ্ গ্রীণ যখন দেখলেন যে, কেউ-ই আর কোনও খোঁজ-খবর নেয় না—তখন কি ভেবে এত জায়গা থাকতে তিনি স্থির করলেন, সামরিক বিভাগকে তাঁর আবিষ্কারের কথা জানাতে হবে। ফ্রিজ্ গ্রীণ জানতেন না যে, যেখানে তিনি তাঁর আবিষ্কারের কথা জানাতে চলেছিলেন সেটি হল বহু সদ্যজাত আবিষ্কারের কবরস্থান। সামরিক বিভাগের কর্ত্তাদের প্রয়োজনীয়তা-বোধ এবং কল্পনা-শক্তি যে কতদূর নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ তা তাঁর জানা ছিল না।

অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে তিনি তাঁর আবিষ্কারের বিশদ বিবরণ দিয়ে তাঁদের এক পত্র লিখলেন। তাঁরা ভেবেই পেলেন না, এই আবিষ্কারের সঙ্গে তাঁদের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে! তবে কেউ কেউ বল্লেন যে যুদ্ধের সময় এই ধরণের ক্যামেরা হয়ত কিছু কাজে লাগতে পারে। অতএব লোকটাকে একেবারে

নিরাশ করে কাজ নেই। আপাততঃ ওকে কিছু কাজ দেওয়া যাক্।

সামরিক বিভাগ থেকে ফ্রিজ্ গ্রীণের উপর আদেশ হল যে, আইল অফ্ ওয়েষ্ট দ্বীপে গিয়ে সেখানকার কতকগুলো ছবি নিয়ে আসতে হবে। ক্যামেরা নিয়ে ফ্রিজ্ গ্রীণ যাত্রা করলেন। তার জন্যে তিনি পাঁচটি গিনি পেলেন। ফিরে এসে ছবিশুদ্ধ একখানা চিঠি পাঠালেন। সে চিঠির আর কোনও উত্তর এল না। ফ্রিজ্ গ্রীণ দেখলেন যে, তাঁরাও তাঁর নাম ভুলে গেলেন।

ব্যবসায়-বুদ্ধি একতিলও তাঁর ছিল না। এতদিন ধরে ক্যামেরা, ফিল্ম আর ছবি তোলার ব্যাপার নিয়ে প্রচুর ঋণও হয়ে গিয়েছিল। অর্থের অভাবে তাঁর এমন অবস্থা হল যে, ছবি নিয়ে আর পরীক্ষা করবার কোনও উপায় তাঁর রইল না। এ-ধারে পাওনাদাররা তাগাদা আরম্ভ করে দিল। কোথা থেকে ঋণ শোধ করবেন ?

অবশেষে পাওনাদারেরা নালিশ করল।

সহায়-সম্বলহীন ফ্রিজ্ গ্রীণ কোথা থেকে সে টাকা শোধ দেবেন ? নিরুপায় হ'য়ে তাঁকে কারাগারে যেতে হল। তাঁর যে সব জিনিষ-পত্র সাজ-সরঞ্জাম ছিল, সমস্ত বিক্রী করে পাওনাদারদের প্রাপ্য অংশ মিটিয়ে দেওয়া হল। জগতের প্রথম সিনেমা-ষ্টুডিও দেনার দায়ে বিকিয়ে গেল। এবং সেদিনের সেই নীলামের মধ্যে জগতের প্রথম কিনেমা যন্ত্র অদৃশ্য হয়ে যায়! হয়ত তার কাঠ থেকে একদিন কারুর ঘরের আগুন একটু বেশী জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু সেই ক্যামেরা যদি সেদিন

কারুর সুনজরে পড়ত, সেদিন কোটি কোটি টাকা সেই যন্ত্রটুকুই এনে দিতে পারত। ফ্রিজ্ গ্রীণকে কারাগারে যেতে হত না !

কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে ফ্রিজ্ গ্রীণ দেখলেন, তাঁর ষ্টুডিও নেই, তাঁর ক্যামেরা নেই, একটিও যন্ত্রপাতি নেই। কারুর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করলেন না। ভাগ্য বলে মেনে নিয়ে নীরবে আপনার মনে আবার সেই সব যন্ত্রপাতি গড়তে লাগলেন।

কায়ক্লেশে জীবিকা অর্জ্জন করে তিনি এবার প্রোজেক্টার তৈরী করবার দিকে নজর দিলেন। এবং বহুদিনের চেষ্টার ফলে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি উন্নত ধরণের একটা প্রোজেক্টার তৈরী করলেন। ধীরে ধীরে আবার ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুললেন এবং এবারেও ভুল করলেন। যাদের সঙ্গে আলাপ করলে তাঁর সুবিধা হত তাদের কাছে তিনি গেলেন না। কয়েকজন প্রসিদ্ধ লোককে তিনি ছবি দেখালেন। তাঁরা দেখে বাহবা দিলেন, এই পর্য্যন্ত।

এই সময় আমেরিকায় এডিসনকে তিনি একখানা চিঠি লিখলেন। চিঠিতে জানালেন তাঁর আবিষ্কারের কথা। তাতেও তাঁর কোন সুবিধা হল না। কিছুদিন পরে শুনলেন, আমেরিকার এডিসন নতুন কিনেমা-যন্ত্র তৈরী করেছেন।

কিছুদিন পরে দেখতে দেখতে চারিদিকে সিনেমার ছবির কথা খবরের কাগজে বেরুতে লাগল। আপনার নিভৃত ঘরে বসে ফ্রিজ্ গ্রীণ সিনেমার নিত্য নব নব খবর শোনেন—শোনেন,

দেশে দেশে লোক নাকি সেই যন্ত্র থেকে লাখ লাখ টাকা উপায় করছে। নিজের ভাঙ্গা ঘরে বসে তিনি দেখেন যে জিনিষ আবিষ্কার করে তিনি পৃথিবীর এককোণে ছেঁড়া পোষাকে পড়ে রইলেন, সেই জিনিষ নিয়েই পৃথিবীতে সোনার কারবার বসে গিয়েছে। ছায়াচিত্র জগৎ-জয়ে বেরুল, আর সেই সঙ্গে যে লোক প্রথম ছায়াচিত্রের সম্ভাবনাকে সফল করে তুলেছিল সে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। সমুদ্রের ধারের বালুকণা সোনা হয়ে উঠল, কিন্তু ফিজ্‌ গ্রীণের ঘরে রাত্রিতে আলো জ্বালবার কাঠ আর জুটল না।

এই সময়কার তাঁর জীবনের কোন কথা আমরা জানি না। শুধু জানি একজন সহৃদয় লোক এই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করে ছায়াচিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন, 'যদি কোনদিন আমার সম্বন্ধে কোন কথা আপনি লেখেন, তা হলে লিখবেন যে, এই দূরে বসে প্রত্যেক দেশের কিনেমা-যন্ত্রের উন্নতিকারকদের নাম উচ্চারণ করে আমি আমার অন্তরের প্রণতি জ্ঞাপন করেছি।'

তারপর ফিজ্‌ গ্রীণের আর কোনও খবর নেই। হঠাৎ ১৯১৬ সালে মিষ্টার ডে বলে এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখা। তখন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। তাঁর তিন ছেলে যুদ্ধে চলে গিয়েছে। মিষ্টার ডে দেখলেন, স্ত্রী এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে ফ্রিজ্‌ গ্রীণ একরকম অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। ওধারে সিনেমা হাউসের মালিকেরা লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করছেন!

ফ্রিজ্‌ গ্রীণের সেই নিদারুণ দুরবস্থা দেখে ব্যথিত হয়ে

মিষ্টার ডে লণ্ডনে এসে সেখানকার বড় বড় সিনেমা-ব্যবসায়ের মালিকদের সঙ্গে দেখা করে, ফ্রিজ্ গ্রীণের দুরবস্থার কথা জানালেন। মিষ্টার ডে চেষ্টা করে মাত্র ১৬১ পাউণ্ড ২ পেন্স চাঁদা সংগ্রহ করে ফ্রিজ্ গ্রীণকে পাঠালেন।

তারপর ১৯২১ সালে আর একবার আমরা ফ্রিজ্ গ্রীণের দেখা পাই। মাত্র একদিনের জন্যে। লর্ড বেভারব্রুকের সভাপতিত্বে ইংলণ্ডের সিনেমা ব্যবসায়ীদের এক বিরাট সভার অধিবেশন বসেছে। ইংলণ্ডের ফিল্ম-ব্যবসায় সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে এই সভা আহ্বান করা হয়েছে। সভায় তুমুল তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হল। কোন মতেই কোন সমস্যার মীমাংসা হয় না। এমন সময় এক অশীতিপর বৃদ্ধ অতি জীর্ণ মলিন বেশে সভার পেছন দিক থেকে সসম্ভ্রমে এগিয়ে এসে জানালেন, এসম্বন্ধে তাঁর কিছু বলবার আছে। অনুমতি পেলে তিনি বলতে পারেন।

সকলেই বিস্মিত হয়ে সেই নামহীন বৃদ্ধের দিকে ফিরে চাইলো। তখন বৃদ্ধ আজীবন ধরে ছায়াচিত্র সম্বন্ধে দিবসে ও নিশীথে যে-সব চিন্তা করেছিলেন, সেই সব কথা বলতে লাগলেন। সভাশুদ্ধ লোক বৃদ্ধের কথা শুনে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেন,—ইংলণ্ডে তাহলে এমন লোকও ছিল, যিনি সিনেমা সম্বন্ধে এইরকম ভেবেছিলেন ?

বক্তৃতার পর বৃদ্ধ তেমনি নীরবে সভার পিছনে গিয়ে বসলেন। সভা-ভঙ্গে সকলে উৎসুক হয়ে বৃদ্ধের পরিচয় নিতে এসে দেখলেন, বৃদ্ধ ফ্রিজ্ গ্রীণের মৃতদেহ সেখানে পড়ে রয়েছে।

সেই মৃতদেহের উপর দিয়ে আজ সোনায় মোড়া পথে সোনার রথের চাকা বিরামবিহীন চলেছে! ছেলেরা আজ ঘরে বসে বসে অঙ্ক গোণে—মেরী পিককোর্ডের মাইনেতে ক'টা গবর্ণরের মাইনে হয়, কোন্ সিনেমা-অভিনেত্রীর পায়ের আঙুল ক'লক্ষ টাকায় ইন্সিওর করা আছে!



বৈদ্যুতিক শক্তি

বর্ষার দিনে যখন হঠাৎ কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়, কোথা থেকে সব শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে আসে ঝড়, কানে বাজে হঠাৎ মেঘের গুরু গুরু ডাক, তখন সেই কালো মেঘের বুক চিরে, রূপোর পাতের মত ঝিলিক দিয়ে ওঠে বিদ্যুৎ—যেন একটা আলোর শেকড় কে উপড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

মনে পড়ে, কতদিন কখনও ভয়ে, কখনও অজানা বিস্ময়ে ঘরের ইলেক্‌ট্রিক আলোয় বসে বসে ভেবেছি, ঐ আকাশের বিদ্যুৎ কি? তখন মনে হয় নি, আকাশে কালো মেঘের বুক চিরে, মনে যে ভয় জাগিয়ে দিয়ে গেল, সেই বিদ্যুৎই আমার ঘরে প্রদীপ হয়ে স্নিগ্ধ আলো দিচ্ছে।

বিদ্যুৎ যে কি তা বহুদিন ধরে বৈজ্ঞানিকরাও বলতে পারেন নি। বৈদ্যুতিক শক্তি বলে একটা জিনিষ আছে তার খবর তাঁরা অনেকদিন পেয়েছিলেন, কিন্তু সে শক্তি কোথায় কি ভাবে আছে, অর্থাৎ তার স্বরূপ কি, তা মাত্র ইদানীং বৈজ্ঞানিকরা জানতে পেরেছেন। আজ বৈজ্ঞানিকরা বলছেন বিদ্যুৎই হল সকল বস্তুর প্রাণ।

আমাদের এই পৃথিবী, এই পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ, দৃষ্টির অগোচর সব অণুর দ্বারা গঠিত। যেমন থাকের পর থাক ইঁট সাজিয়ে নানা রকমের বাড়ী হয়, সেই রকম থাকের পর থাক, অণুর পর অণু সাজিয়ে জগতের সব জিনিষ গড়ে উঠেছে।

বহুদিন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করতেন যে, এই অণুর চেয়ে ছোট জিনিষ আর কিছু নেই। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, যাকে আর ভাগ করা যায় না বলে আমরা স্থির করেছিলাম, সেই অণুও দুই থেকে আরম্ভ করে আরও অনেক ছোট ছোট জিনিষ দিয়ে তৈরী। যে সব জিনিষ দিয়ে অণুর দেহ গঠিত বৈজ্ঞানিকরা তার নাম দিলেন পরমাণু। কিন্তু মানুষের সন্ধান সেখানেই থেমে গেল না। আবার গবেষণার পর দেখা গেল যে পরমাণুই সমস্ত জিনিষের শেষ ভিত্তি নয়। পরমাণুর ভেতরেও অন্য জিনিষ রয়েছে; তবে যে-অবস্থায় আছে, সে অবস্থায় তাদের আর ইঁট, কাঠ, পাথরের মতন কঠিন জিনিষ বলে মনে হয় না। সকলের চেয়ে বিস্ময়ের কথা যে তারা সেখানে স্থির হয়ে বসে নেই। জড় জিনিষ ভাগ করতে করতে বৈজ্ঞানিকরা যেখানে শেষ এসে পৌঁছলেন, সেখানে তাঁরা

দেখেন যে, যাকে জড় বলে মনে হয়েছিল, তার মধ্যে অতি তীব্র বেগে শক্তি ক্রিয়মাণ রয়েছে। প্রত্যেক পরমাণু সেই সব তীব্র গতিশীল শক্তি-কণা অর্থাৎ বিদ্যুতের কণা দ্বারা গঠিত। বৈজ্ঞানিকরা সেই বিদ্যুৎ-কণার নাম দিলেন ইলেকট্রন আর প্রোটন।

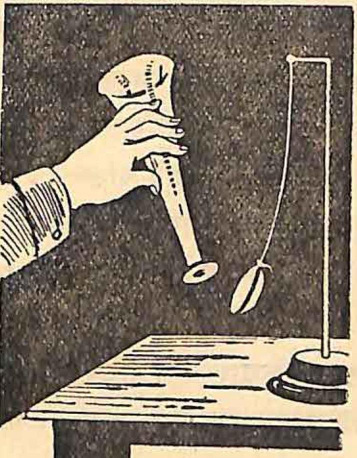
এই বিশ্ব-চরাচর হল এই ইলেকট্রন-প্রোটনের অর্থাৎ বিদ্যুৎ-কণার সৃষ্টি। কুমোর যেমন মাটি দিয়ে নানা রকমের জিনিষ তৈরী করে, তেমনি ধারা জগৎস্রষ্টা বিদ্যুৎ-কণা দিয়ে এই জড় জগৎ তৈরী করেছেন। এমন কোন জিনিষ নেই যার মূলে এই শক্তি-কণা নেই। তাই বিদ্যুৎই হল বিশ্ব-প্রসবিনী।

নিউটন থেকে সাহা পর্য্যন্ত, বিজ্ঞানের যে-সময়কে আমরা বিজ্ঞানের বর্ত্তমান যুগ বলি, তার প্রথম সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হল বৈদ্যুতিক শক্তি—ইংরেজীতে যাকে বলে Electricity বা Electric Power. এই বৈদ্যুতিক শক্তি আজ মানুষের হাতে



বিদ্যুৎ-প্রবাহের আলোক-চিত্র

সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এই রহস্যময় শক্তি আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অসীম শক্তির অধিকারী হয়েছে। মানুষ অনেক জিনিষ আবিষ্কার করেছে—সে শিখেছে কি করে পশুদের কাজে লাগাতে হয়, সে জেনেছে মাটির তলায় কোথায় কি ভাবে খনি আছে, সে খুঁজে বার করেছে মাটির তলা থেকে কয়লা, কয়লাকে পুড়িয়ে সে আবিষ্কার করেছে বাষ্পশক্তি। কিন্তু এ-



কাঁচ বা গালা পশমে ঘষিয়া কোনও হাল্‌কা জিনিষের কাছে আনিলে উক্ত কাঁচ সেই হাল্‌কা জিনিষ টানিয়া লয়

সকলের চেয়ে ঢের মূল্যবান আর শক্তিশালী জিনিষ যা সে আবিষ্কার করেছে এবং যা সাক্ষাৎভাবে মানুষের সমস্ত কাজকর্ম্ম জীবনধারার সঙ্গে মিশে গিয়েছে, সে হচ্ছে Electricity অর্থাৎ বৈদ্যুতিক শক্তি। এই রহস্যময় শক্তির

সাহায্যে আজ জগতের অন্ধকার রাত্রি আলোকিত হয়ে উঠেছে। এই বিদ্যুৎ মানুষকে সাহায্য করছে অনায়াসে বড় বড় যন্ত্র চালাতে—যে-সব যন্ত্র থেকে আসছে মানুষের উপভোগের ও প্রয়োজনের বিচিত্র সব সামগ্রী। মানুষ এর সাহায্যে দুরধিগম্য পাহাড়ের উপর দিয়ে—কখন বা অন্ধকার মাটীর তলা দিয়ে—রেল চালাচ্ছে, ট্রাম চালাচ্ছে। এর সাহায্যে মানুষ তার ব্যাধি সারাচ্ছে—এমন কি, রান্নাঘরের সমস্ত কাজ পর্য্যন্ত করিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু মানুষকে যে এমন ভাবে সাহায্য করছে, সে যে মানুষের একান্ত বন্ধু তা নয়, অতর্কিত অবস্থায় তাকে স্পর্শ করলে সেই আবার এনে দেয় মৃত্যু। আজ মানুষ বৈদ্যুতিক শক্তির রহস্য আবিষ্কার করে এমন একটা বিরাট শক্তির সহায়তা পেয়েছে যা, একাধারে হল ঘরে তার রাত্রির দীপশিখা, বাইরে পথে তার পথ-চলার যান, কর্ম্মশালায় তার প্রধান-শক্তি, তার ব্যাধিতে ঔষধ, তার যুদ্ধে অস্ত্র, তার জ্ঞানসাধনায় বিশ্বের রহস্য-আবিষ্কারের সবচেয়ে উজ্জ্বল দীপ-বর্ত্তিকা! সন্ধ্যাবেলায় ঘরে সুইচ্ টা টিপ্ লেই অনায়াসে আজ আমাদের ঘর আলোয় ভরে ওঠে; তেমনি যাঁরা এই রহস্যময় শক্তির আবিষ্কার করলেন, তাঁরাও পৃথিবীর মধ্যযুগের অন্ধকারের মধ্যে একটা অপরূপ আলোর শিখা জ্বালিয়ে তুল্লেন। সেই আলোয় বিজ্ঞানের নবযুগের প্রভাতের সূত্রপাত হল।

এই Electricity কথাটির মানে কি? কেমন করে এই কথাটির উদ্ভব হল? তা হলেই বৈদ্যুতিক শক্তির জন্ম-রহস্যের কথা জানতে পারা যাবে। Greek ভাষায় Elektron

বলে একটা শব্দ আছে। এই Elektron-এর মানে হল—ইংরেজীতে যাকে আমরা বলি amber, বাংলায় যাকে আমরা বলি স্ফটিক। এই Elektron কথা থেকে পরে এলো Electricity. এখন এই Elektron বা স্ফটিকের সঙ্গে বৈদ্যুতিক শক্তির কি যোগ দেখা যাক্। এখানে বলে রাখা ভালো, এই নব-শক্তির নামকরণ করেন একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক Dr. Gilbert of Colchester. তাঁর কথা যথাসময়ে বলছি।

যিশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় তিনশো বছর আগে অর্থাৎ প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, গ্রীস দেশে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন—তাঁর নাম হল থেল্স্। তিনি সহসা আবিষ্কার করলেন যে পশম দিয়ে ঘষলে স্ফটিক অর্থাৎ সেই Greek Elektron কাগজের টুক্রোর মত হাল্কা জিনিষ টেনে নেয়। থেল্স্ মাত্র এই ঘটনাটি লক্ষ্য করলেন, তার বেশী তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। কেন যে স্ফটিক ঐ রকম ভাবে আকর্ষণ করে, সে-সম্বন্ধে তিনি কিছুই গবেষণা করলেন না। কারণ সে-কালের লোকের মনে আজকালকার যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, তা জাগে নি। এইরকম আরও দু'একটা ব্যাপারেও কোন কোন লোক লক্ষ্য করলেন যে, কি একটা অদৃশ্যশক্তি এইরকম ভাবে স্ফটিক বা কাঁচের সঙ্গে ঘর্ষিত হলে হাল্কা জিনিষ আকর্ষণ করে।

প্রাচীন গ্রীসের অমর মহাকবি হোমার তাঁর Odyssey কাব্যে এক জায়গায় বিদ্যুৎপাত বর্ণনা করতে করতে অজ্ঞাতসারে বর্ত্তমান বৈদ্যুতিক-তত্ত্বের একটা বড় কথা বলে ফেলেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে বজ্রপাত হয়ে যাবার পরই সমস্ত বাতাসটা কেমন গন্ধকের গন্ধে ভরে গেল! আজকে অবশ্য তার কারণ আমরা জানি! বৈজ্ঞানিক শক্তিসম্পন্ন Oxygen এইভাবে Ozone বাষ্পে পরিণত হয়। কিন্তু কবির কল্পনা হিসেবে সেদিন এ-সব ব্যাপার কেউই লক্ষ্য করেনি।

তারপর এই বৈদ্যুতিক শক্তির রহস্যময় অস্তিত্বের খবর মানুষ আর এক মজার ব্যাপারে বুঝতে পারে। কিন্তু এখানেও কেন বা কি ভাবে এই শক্তি কাজ করে, তার খবর নেওয়ার কেউ দরকার বোধ করল না। এ্যারিষ্টটল ছিলেন গ্রীসের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত আর বৈজ্ঞানিক। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় হাজার বছর ধরে সমস্ত য়ুরোপে তাঁর এতদূর প্রভাব ছিল যে, তাঁর কথা লোকে অভ্রান্ত সত্য বলে মান্‌ত। যা এ্যারিষ্টটল বলেন নি, সে কথা লোকে কিছুতেই বিশ্বাস করত না। এই অন্ধ বীরপূজার ফলে য়ুরোপে বহু যুগ ধরে কোনও মানুষ কোনও স্বাধীন-চিন্তা বা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অগ্রসর হতে পারেনি। যখনি কেউ কোনও একটা নূতন কথা বল্‌তে গিয়েছে, লোকে এ্যারিষ্টটলের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখেছে। যদি মিল্‌ত, তবে লোকে সত্যি বলে গ্রহণ করত। গ্যালিলিও যখন বল্লেন, পৃথিবী ঘুরছে, তখন লোকে গ্যালিলিওর কথা শুনলেই না। তার প্রধান কারণ গ্যালিলিও যা বলতে চাইলেন, তা হল এরিষ্টটলের শিক্ষার বিপরীত। এমন অন্ধ বীরপূজার ফলে জগতের বহু ক্ষতি হয়। সে যাই হোক্‌, এখন যে-ব্যাপারের কথা বলছিলাম,

সেটা হচ্ছে যে, এ্যারিষ্টটল নিজে একজন মস্তবড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি নানা বিষয়ে গবেষণা করেন। প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে গবেষণা করেন এবং সাক্ষাৎভাবে বহু প্রাণী পর্য্যবেক্ষণ করে তিনি এক অদ্ভুত ধরণের সামুদ্রিক মাছের খবর পৃথিবীকে দিলেন। তার নাম হল টর্পেডো মাছ। এ্যারিষ্টটল লক্ষ্য করে দেখলেন যে, এই মাছের সংস্পর্শে



ডাঃ গিলবার্ট

অন্য মাছ এলে প্রায়ই মরে যায়। এবং তারপর য়ুরোপে বহু বছর ধরে যে-সব মানুষ বাতে কষ্ট পেত, তারা এই মাছ জ্যান্ত ধরে যে-জায়গায় বাত হত সেইখানে ছোঁয়াত, এবং তার ফলে বহুক্ষেত্রে বাতের ব্যাথার উপশম হত। কেন যে তা হত, তখন মানুষ তা জানত না। এখন

আমরা জানি যে, ব্যাপারটা হলে এই মাছ বিদ্যুতের সৃষ্টি করে। মানুষ আজকাল যে বৈদ্যুতিক চিকিৎসা করায়, বিদ্যুতের খবর না জেনেও অজ্ঞাতসারে সেদিন মানুষ এইভাবে সেই বৈদ্যুতিক চিকিৎসাই করাত। কিন্তু তখন ভাবত—সেটা ঐ মাছেরই গুণ। এইভাবে হাজার বছর চলে যায়, লোকে বৈদ্যুতিক শক্তির কোনও খবর আর পায়নি ; ভাবতেও পারেনি যে বৈদ্যুতিক শক্তি বলে আলাদা কোনও একটা জিনিষ আছে।

ইতালীতে যখন গ্যালিলিও সৌরজগৎ সম্বন্ধে তাঁর নতুন মতবাদ প্রচার করছিলেন, সেই সময় ইংলণ্ডে একজন বৈজ্ঞানিক চুম্বকের শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন। তাঁর নাম হল ডাক্তার গিলবার্ট। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের এসেক্স্ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত কোলচেষ্টার শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য ইতিহাসে তিনি Dr. Gilbert of Colchester বলে খ্যাত। তিনি আসলে ছিলেন ডাক্তার—যে-সে ডাক্তার নন্, জগৎ-খ্যাত সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের তিনি ছিলেন ডাক্তার এবং ইংলণ্ডে সেই সময়ে যে রয়েল কলেজ অফ ফিজিসিয়ান্স্ ছিল, তিনি ছিলেন তার সভাপতি। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর যুগান্তকারী বই প্রকাশ করলেন—On the Magnet, Magnetic Bodies and On the Great Magnet—our Earth. Dr. Gilbert পরীক্ষা করে দেখলেন যে শুধু স্ফটিক নয়, বহু জিনিষ—গন্ধক, কাঁচ, মোম প্রভৃতি—এই রকম ঘর্ষণ পেলে তার দিকে

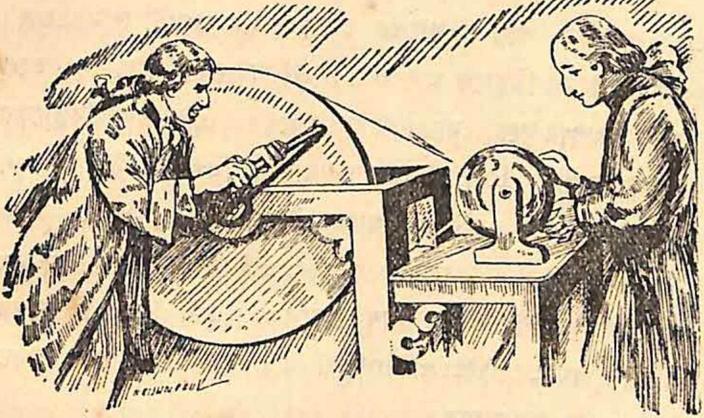
হাল্‌কা জিনিষ আকর্ষণ করে। তিনি এই ব্যাপারটাকে একটা নাম দিতে চাইলেন। যে সব জিনিষ এই রকম আকর্ষণ-শক্তি সৃষ্টি করে, তাদের নাম তিনি দিলেন Electrics—তার কারণ প্রথমে Elektron অর্থাৎ স্ফটিক থেকেই এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করা গিয়েছিল বলে। এবং সেই আকর্ষণ-শক্তির নাম দিলেন Electricity। এই ভাবে জগতে Electricity কথাটার উদ্ভব হল। অবশ্য এর বেশী আর কিছু তিনি জানতেন না। তবে ডাক্তার গিলবার্ট তাঁর সময়কার সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের এ-বিষয়ে বিশেষভাবে গবেষণা করবার জন্যে অতি সুন্দর ভাষায় আহ্বান করলেন। তিনি তাঁর বইএর ভূমিকায় লিখলেন :—"To you alone, honest and true men of Science, who seek knowledge, not from books only, but also from things themselves, do I address this new sort of Philosophy. If any disagree with my opinions, let them at least take note of the experiment and discoveries which have been worked out and demonstrated by me with many pains and vigils and expenses. Let them rejoice in these and employ them to better use if they are able."

এই হল নবযুগের বিজ্ঞানের প্রথম আহ্বান। এবং গিলবার্টের প্রাণময়ী আহ্বানবাণী ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিকদের অন্তরে পৌঁছল। সেই সময় অর্থাৎ ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডে রবার্ট বয়লি নামে আর একজন বড় বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তিনি ছিলেন আর্ল-অফ কর্কের ছেলে। রবার্ট জড় পদার্থের সংগঠন এবং বায়ুর গঠন সম্বন্ধে যুগান্তকারী গবেষণা করলেন। তিনিই প্রথম জগতে প্রমাণ করলেন যে, ছয়টি মূল পদার্থ পৃথিবীতে আছে। তিনিই প্রথম মৌলিক পদার্থের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণ করলেন যে, সেই হল মৌলিক পদার্থ—যাকে যতই ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যাক্ না কেন, সেই অবস্থাতেই সে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবে। যেমন এক টুক্‌রো লোহা—তাকে যত ক্ষুদ্র অংশেই ভাগ করা যাক্ না কেন, সে লোহাই থেকে যাবে। তিনিই প্রথম সমস্ত জড়-পদার্থ দু'ভাগে ভাগ করলেন। একটা হল মৌলিক পদার্থ, আর একটা হল যৌগিক পদার্থ। দু'টি মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে যে-জিনিষ প্রস্তুত হয়, তাকেই যৌগিক পদার্থ বলা হয়। এই গবেষণার জন্য তাঁকে বর্ত্তমান রসায়ন-বিজ্ঞানের জনক আখ্যা দেওয়া হয়।

এই গবেষণার ফলে রবার্ট বয়লির নাম সারা য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়ল। সকল দেশের শিক্ষিত লোকই তাঁর কথায় আস্থা স্থাপন করতেন। তিনি বিদ্যুৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ব'লে গেলেন এবং রবার্ট বয়লি বলেছেন বলে য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক মহলের দৃষ্টি সেদিকে বিশেষভাবে পড়ল। তিনি বৈদ্যুতিকতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা অতি প্রাথমিক গবেষণা করলেন; কিন্তু সেই গবেষণা থেকেই বৈদ্যুতিকশক্তি মানুষের কাজে লাগানোর প্রথম এবং প্রধান ইঙ্গিত মানুষ পেল। তিনি দেখালেন যে একটা স্ফটিক যখনই একটা জিনিষকে আকর্ষণ করে, সেই জিনিষটাকে আকর্ষণ করার পরই তার সেই আকর্ষণী-

শক্তি সেই ঘষা স্ফটিকে থেকে যায়। সেটা হয় তখন বৈদ্যুতিক শক্তির একটা ভাণ্ডার বা আধার।



বিদ্যুৎ তৈয়ারী করিবার পুরাতন যন্ত্র

তারপর প্রুসিয়াতে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে আর একজন বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেন—তাঁর নাম হলে Von Guencka। তিনি বিদ্যুৎ-তত্ত্বে আর একটু দূর অগ্রসর হলেন। তিনি জানালেন যে, যে-জিনিষ ঘষে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়নি, তাকে যদি বৈদ্যুতিক-শক্তিসম্পন্ন জিনিষের সংস্পর্শে আনা যায়, তা হলে সে-জিনিষও বিদ্যুৎ-শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠবে। এরপর ইংলণ্ডে গ্রেসি এবং ফ্রান্সে ডুফয়—তাঁরা দু'জনে বর্ত্তমান বৈদ্যুতিক-তত্ত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁরা দু'জনেই পরীক্ষা করে দেখালেন যে, বিদ্যুতের দু'রকম জাতি আছে। ডুফয় আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ শক্তির কথা—যাকে ইংরেজীতে আমরা বলি

Law of Attraction and Repulsion এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় পরে যা Positive এবং Negative বলে পরিগণিত হয়েছে—তার খবর আমাদের দিলেন।

এতদিন পরে বিদ্যুতের চরিত্রের মূল কথাটা জানা গেল। একই রকমের বিদ্যুতে যদি দু'টো জিনিষ ভরা যায়, তা হলে তারা পরস্পর দূরে যেতে চেষ্টা করবে। এটা হল বিদ্যুতের বিকর্ষণ অর্থাৎ Repulsion। আবার বিপরীত বিদ্যুতে পূর্ণ করলে অর্থাৎ একটাতে আছে Negative বিদ্যুৎ, আর একটাতে আছে Positive বিদ্যুৎ, এই রকম দু'টো জিনিষ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করবে। এটা হল বিদ্যুতের আকর্ষণ অর্থাৎ Attraction। এই হল বৈদ্যুতিক তত্ত্বের প্রধান এবং প্রথম সূত্র।

তারপর ষ্টিফেন গ্রে নামে একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক এসে আর একটু অগ্রসর হলেন। তিনি দেখলেন যে কতকগুলো জিনিষ আছে—যেমন কাঁচ, গন্ধক, রবার প্রভৃতি—যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ অবাধে চলাফেরা করতে পারে না ; তাদের বলে অপরিচালক। আর কতকগুলো জিনিষ আছে—যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ অবাধে চলাফেরা করতে পারে—যেমন, জল, যে কোনও ধাতু এবং জীব-দেহ ; তাদের বলে পরিচালক। কোনও বিদ্যুৎপূর্ণ জিনিষকে হাত দিয়ে ধরলে বিদ্যুৎ আমাদের দেহের মধ্য দিয়ে মাটিতে চলে যায় ; কিন্তু একটা কাঁচের পা-ওয়ালা চেয়ারে বসে বিদ্যুৎ-পূর্ণ জিনিষ ছুঁলে বিদ্যুৎ আমাদের দেহের মধ্য দিয়ে মাটিতে আর পালাতে পারবে না।

ষ্টিফেন গ্রে-র পর যে সব বৈজ্ঞানিক বিদ্যুৎতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তাঁদের প্রধান চিন্তা ছিল, কি ক'রে বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় এবং উৎপন্ন বিদ্যুৎ কি ভাবে ধ'রে রাখা যায়। তখন অবশ্য বিদ্যুৎ মানুষের কি কাজে লাগতে পারে, সে-সব কথাই ওঠেনি। তখন প্রধান সমস্যা ছিল, কি ক'রে বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় এবং কি ক'রেই বা সেই উৎপন্ন বিদ্যুৎকে ধ'রে রাখা যায়। কারণ তা না হলে তো তাকে দিয়ে কোন কাজ চলবে না।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের Leydan শহরে একজন ডাচ অধ্যাপক—তাঁর নাম হ'লো মুসেন্‌ব্রোক—অনেকদিন ধ'রে এই ব্যাপার নিয়ে নানারকম গবেষণা করছিলেন। একদিন তাঁর এক ছাত্র—তার নাম কুনিয়স—বিদ্যুৎ নিয়ে পরীক্ষা করছিল। তিনি তখন ল্যাবরেটরীতে ছিলেন না। একটা কাঁচের পাত্রে জলটাকে রেখে সেই জলটাকে বিদ্যুৎ-যুক্ত করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। বিদ্যুৎ-যন্ত্র চালিয়ে একটা ধাতুর চেনের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ জলে চালাতে লাগলো। সে-সময়ে বিদ্যুৎ তৈরী করবার জন্যে কোনও ভাল যন্ত্র ছিল না। গন্ধকে পশম ঘষে একটু আধটু বিদ্যুৎ তৈরী করা হতো—এবং তাই নিয়েই শুধু ল্যাবরেটরীর পরীক্ষার কাজ চলতো। বেশী বিদ্যুতের স্বরূপ তখন মানুষ জানতো না। তাই ছেলেটি বিদ্যুৎ-চালানোর পর নির্ভাবনায় যেমন সেই ধাতুর চেনটা জল থেকে তুলে নিতে যাবে,—অমনি এক নিদারুণ আঘাত লেগে কুনিয়স্ মাটিতে প'ড়ে গেল। এত বিদ্যুতের সংস্পর্শে মানুষ এর পূর্ব্বে আর আসেনি।

মুসেনব্রোক ফিরে এসে যখন এই সংবাদ শুনলেন, তখন তাঁর অন্তর আনন্দে নেচে উঠলো। এত বিদ্যুৎ জমা হ'লো কেমন করে ? তিনি স্বয়ং আবার সেই গবেষণা করতে লাগলেন। এবার কুনিয়স বল্লো যে, ফ্রান্সের সিংহাসনও যদি তাকে দেওয়া হয়, তা'হলেও সে আর সেই চেন ধরছে না। বিজ্ঞান-সাধক মুসেনব্রোক স্বয়ং সেই চেন ধরবেন স্থির করলেন। ঠিক সেই রকম ভাবে জলে বিদ্যুৎ চালানো হ'লে পর মুসেনব্রোক যেই চেনে হাত দিলেন, অমনি এক নিদারুণ ধাক্কা খেয়ে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। বৃদ্ধ লোক—সহ্য করতে পারবেন কেন ? এতখানি আঘাত লাগে যে, তিনদিন তিনি বিছানা থেকে উঠতে পারেন নি।

কিন্তু মুসেনব্রোকের এই আঘাত লাগার গল্প য়ুরোপের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়লো। বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের ল্যাবরেটরীতে এই পরীক্ষা করতে লাগলেন এবং দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিদ্যুৎ জমা করে রাখবার জন্যে একরকম যন্ত্র তৈরী হলো—তার নাম হলো Leydan জার। Leydan শহরে এই পরীক্ষা প্রথম হয়েছিল বলে সেই যন্ত্রটির নাম হলো Leydan Jar এই Leydan Jar-এর ব্যাপার থেকে জানা গেল যে, পাশাপাশি তড়িৎপ্রভাবান্বিত কয়েকটি ধাতুপাত তড়িৎ-বিরোধী—অর্থাৎ যাদের আমরা বলেছি অপরিচালক—সেই রকম পদার্থের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন রাখলে ধাতুপাতের তড়িৎ ঘনীভূত হয়। Leydan Jar হ'লো এইরকম বিদ্যুৎ ঘন করবার যন্ত্র।

Leydan Jar সৃষ্টির ফলে তড়িৎ ঘন করা সম্ভব হ'লো। কিন্তু যতক্ষণ-না একটা অবিচ্ছিন্ন তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল, ততক্ষণ বিদ্যুৎকে নিয়ে মানুষের কোনও কাজে লাগান সম্ভব হয়নি। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Volta সর্ব্বপ্রথম বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করলেন। তাঁর সৃষ্ট যন্ত্র বিদ্যুৎতত্ত্বে একটা যুগান্তর আন্‌লো এবং তাঁর নামে সেই যন্ত্র আজ Voltaic Cell অর্থাৎ ভোল্‌টা বিদ্যুৎ-ভাণ্ড নামে পরিচিত।

য়ুরোপের মাত্র কয়েকজন বৈজ্ঞানিক যখন যন্ত্রের সাহায্যে ঘর্ষণের ফলে সামান্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তাই নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন, সেই সময় আমেরিকার বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা এবং বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এক অদ্ভুত উপায়ে প্রমাণ করলেন যে, যন্ত্রের উৎপন্ন বিদ্যুৎ আর আকাশের বিদ্যুৎ এক।

প্রায় দু'শো বছর আগে আকাশের বিদ্যুৎকে সাধারণ লোকে আগুন বলে মনে করত। ফ্রাঙ্কলিনের ধারণা কিন্তু অন্য রকম ছিল। তিনি আকাশের বিদ্যুৎকে মাটিতে আন্‌বার চেষ্টা করতে লাগলেন। একটা প্রকাণ্ড ঘুড়ি তৈরী করে, তার গায়ে লোহার পাতলা শিক বসালেন। তারপর একদিন যখন আকাশ মেঘে ভরে এল, লাটাই-এর সূতোর শেষে একটুক্‌রো লোহা বেঁধে তিনি ঘুড়ি ওড়াতে লাগলেন। আকাশে অল্পক্ষণ পরে বিদ্যুৎ চমকে উঠল, এবং আশ্চর্য্যের ব্যাপার, সেই সূতোয় লাগান লোহা থেকেও বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ বেরুতে লাগল। পাগলের খেয়াল ভেবে অনেক লোক কৌতূহলবশে সেখানে সমবেত হয়েছিল।

তারা যখন চোখের সামনে সেই ব্যাপার দেখল, তখন তারা সবাই অবাক হয়ে গেল। কিন্তু কি করে এই বিদ্যুৎকে সংরক্ষণ করে মানুষের কাজে লাগান যায়, তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে গভীর গবেষণা চল্‌তে লাগলো।

বৈদ্যুতিক শক্তিকে মানুষের কাজে লাগাবার পন্থা আবিষ্কারের জন্য জগৎ চিরদিন আলেসান্দ্রো ভোল্টার নিকট ঋণী থাকবে। একটা অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করবার পন্থা ভোল্টা প্রথম আবিষ্কার করেন। এক অদ্ভুত উপায়ে কিন্তু আবিষ্কারটির সংঘটন হয়।

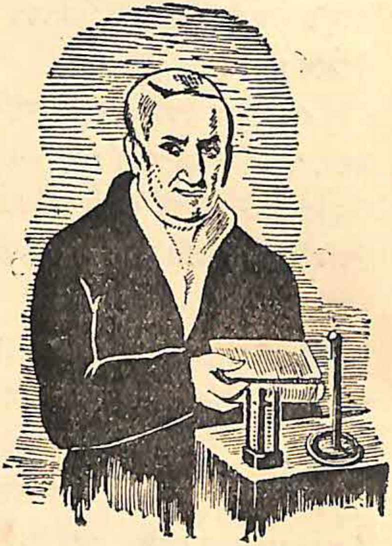
লুইগী গ্যালভিনি নামে শারীরতত্ত্বের একজন অধ্যাপকের স্ত্রীর ভয়ানক অসুখ হয়। গ্যালভিনি স্ত্রীকে খুব ভালবাসিতেন। বহুদিন তাঁর পরিচর্য্যা করেও কোন সুফল ফলল না। অবশেষে একজন পরামর্শ দিলেন যে, ব্যাঙের ঝোল খাওয়াতে পারলে হয়ত উপকার হতে পারে। সেই কথামত তাঁর ল্যাবরেটরীতে যে-সব ব্যাঙ ছিল, সেগুলো কাটা হয়ে গেলে, তাঁর জন্যে ব্যবহার হত। একদিন গ্যালভিনি উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর এক ছাত্র কাটা ব্যাঙ আন্‌তে গিয়ে যেই ছুরি দিয়ে ব্যাঙটাকে ছুঁয়েছেন, দেখেন অমনি মরা ব্যাঙের পা-টা নড়ে সোজা হয়ে উঠল। হঠাৎ মরা ব্যাঙকে নড়তে দেখে ছাত্রটির ভয়ানক কৌতূহল হল। সে তৎক্ষণাৎ গ্যালভিনিকে ডেকে আনল। তিনি এসে বহু পরীক্ষার পরে দেখেন যে, সেই টেবিলে বিদ্যুৎ তৈরী করবার একটা ছোট যন্ত্র ছিল। ঘটনাচক্রে সেই ছুরির সঙ্গে সেই বিদ্যুৎ তৈরী করবার যন্ত্রটি এবং ব্যাঙের দেহ একই সঙ্গে

সংযুক্ত হওয়ার ফলে, ব্যাঙের পা-টা ঐরকম ভাবে নড়ে উঠেছে।

এই থেকে কোনও নতুন আবিষ্কারের সূত্র বেরুতে পারে স্থির করে, গ্যালভিনি দিনের পর দিন গবেষণা করে দেখলেন যে, বিদ্যুৎ-যন্ত্রটি চালিয়ে যখনি ছুরির ডগা দিয়ে ব্যাঙের দেহের যে-কোনও অংশ তিনি স্পর্শ করেন, সেই অংশ তখনই সাড়া দিয়ে নড়ে ওঠে।

গ্যালভিনির ধারণা হল যে, বিদ্যুৎ-যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে বজ্রপাতের সময় তিনি পরীক্ষা করে দেখবেন, অনুরূপ ফল পাওয়া যায় কি না। একটা মরা ব্যাঙের দেহকে তামার পাত দিয়ে ফুঁড়ে ঝড়ের সময় তাঁর বাড়ীর লোহার রেলিঙে টাঙিয়ে রাখতে গিয়ে দেখেন, ঝড়েরও প্রয়োজন নেই, তামার সঙ্গে লোহার সংস্পর্শ হওয়া মাত্রই ব্যাঙের দেহ ঠিক আগেকার মত নড়ে উঠল। সেই থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, জীব-দেহে একরকম বিদ্যুৎ সঞ্চিত থাকে। ইতালীর বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সমক্ষে গ্যালভিনি তাঁর এই নতুন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন।

ভোল্টার কানে গ্যালভিনির ব্যাঙ নিয়ে এই অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা গিয়ে পৌঁছল। তিনি জন্মেছিলেন কবি হয়ে; কিন্তু রহস্য জানবার অদম্য পিপাসা তাঁকে বৈজ্ঞানিক করে তোলে। গ্যালভিনি তখন তাঁর এই নতুন গবেষণার কথা ঘোষণা করেন, তখন ভোল্টা পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন এবং বিদ্যুৎতত্ত্ব নিয়ে তিনিও গবেষণা করলেন। গ্যালভিনির



আলেসাণ্ড্রো ভোল্টা

কথা কিন্তু তাঁর বিশ্বাস হল না। তাঁর ধারণা হল যে, বিদ্যুৎ ব্যাঙের দেহে বা কোন জীবদেহে নেই, আর্দ্র মাংসপিণ্ডের সঙ্গে ধাতুর সংস্পর্শজনিত বাইরে থেকে বিদ্যুৎ ব্যাঙের দেহে সঞ্চালিত হয়ে ঐরকম ক্রিয়া উৎপাদন করেছে। ভোল্টা বহু পরীক্ষার পর গ্যালভিনির সেই নতুন তত্ত্বকে ভুল বলে ঘোষণা করলেন। ভোল্টা দেখালেন যে তড়িতের উৎস ব্যাঙের দেহে নয়; দুটি বিভিন্ন ধাতুখণ্ডের সংস্পর্শে ঐরূপ বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হয়েছে—ব্যাঙের শিরা-উপশিরা শীঘ্র উত্তেজিত হয় বলে সেটা কেবলমাত্র তড়িৎ-নির্দ্দেশকের কাজ করছিল। তাঁর কথার প্রমাণ স্বরূপ তিনি একটা নতুন পরীক্ষা করলেন। এই পরীক্ষায় তিনি ব্যাঙের দেহ একেবারে নিলেন না। ব্যাঙের দেহের পরিবর্ত্তে একটা এ্যাসিড-সিক্ত বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করলেন। দস্তা ও তামার দুটো বিভিন্ন পাত সেই বস্ত্রখণ্ড দ্বারা যুক্ত করে দেখালেন যে, তাতে তড়িৎ উৎপন্ন হয়। সেই পরীক্ষার পর গ্যালভিনির তত্ত্ব অসার

বলে প্রতিপন্ন হল এবং সেইদিন থেকে বিদ্যুৎতত্ত্বে নব-যুগের সৃষ্টি হল।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ভোল্টা তাঁর বিখ্যাত পাইল বা তড়িৎস্তূপ আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে জগতে অবিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিকপ্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হল। আজ যে আমরা দাসীর মত বিদ্যুৎকে জগতের নানা কাজে লাগাতে পারছি, সেদিন সেই বিদ্যুদ্‌ভাণ্ড সৃষ্টি করবার পর থেকেই তা সম্ভব হয়।

এই আবিষ্কারের ফলে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভোল্টার ওপর সম্মান বর্ষিত হতে লাগল।

ভোল্টা বিদ্যুৎতত্ত্বের যে ভিত্তি স্থাপন করলেন, মাইকেল ফ্যারাডে এসে সেই ভিত্তির ওপর বর্ত্তমান বিদ্যুৎতত্ত্বের বিরাট প্রাসাদ তৈরী করলেন। সেইজন্য মাইকেল ফ্যারাডেকে বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

ভোল্টার পর ওয়ারটেড বলে একজন দিনেমার অধ্যাপক দেখালেন যে বিদ্যুৎবাহী তারের চারপাশে সর্ব্বদাই একটা চুম্বক-ক্ষেত্র তৈরী হয়। এই আবিষ্কারের ফলে প্রথম প্রতিপন্ন হল যে, তড়িৎ ও চুম্বক নামে যে দুটি শক্তি এযাবৎকাল পরস্পর সম্বন্ধরহিত বলে বিবেচিত হত, আসলে তারা ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধযুক্ত। তারপর ফ্যারাডে এসে চুম্বক-প্রভাবে তড়িৎ প্রতাড়নের সূত্রগুলি আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের জগতে যুগান্তর আনলেন এবং সেই সঙ্গে তিনি জগৎকে দিয়ে গেলেন—বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক এবং বৈদ্যুতিক সমস্ত যন্ত্র তৈরী করবার মূলসূত্রগুলি। এই সূত্রগুলি

অনুসরণ করে বিদ্যুৎসঞ্চারী ডাইনামোর সাহায্যে মানুষ আজ বিদ্যুৎকে কাজে লাগিয়ে অঘটন ঘটাচ্ছে।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের স্যারে কাউন্টিতে নিউ-ইটন শহরে মাইকেল ফ্যারাডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বাপমা'র তৃতীয় সন্তান ছিলেন। অতি দরিদ্র এক কামারের ঘরে ইংলণ্ডের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৮০১ সালে যখন ফ্যারাডে মাত্র দশ বছরের বালক, তখন তাঁদের সংসার অচল হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে ফ্যারাডের বাবা দাতব্য সাহায্য গ্রহণ করে কোনও রকমে জীবিকা-নির্ব্বাহ করতে লাগলেন। এই সময় ফ্যারাডেকে সপ্তাহে মাত্র একখানা রুটি খেয়ে থাকতে হয়েছে।



মাইকেল ফ্যারাডে

এমনি যাদের সংসারের অবস্থা তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার যে উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে, আশা করাই ভুল। তবুও দৈব কৃপায় কয়েকজন ভদ্রলোককে ধরে ফ্যারাডের বাবা ছেলের বাল্য-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বাল্য-শিক্ষা নিতান্ত বাল্য-শিক্ষাই হয়ে রইল—মোটামুটিভাবে কোনও রকমে

অক্ষরপরিচয় এবং সামান্য কিছু যোগ-বিয়োগ শেখা হল মাত্র।

ফ্যারাডের তখন তেরো বছর বয়স। বাপ দেখলেন, ছেলে যদি সংসারে দুপয়সা না আনে, তা'হলে চলে না। সুতরাং সেই তেরো বছর বয়সেই বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করে ফ্যারাডে জর্জ্জ রিবো বলে একজন দফ্‌তরীর দোকানে একটা কাজ নিলেন। জর্জ্জ রিবোর বই-এর ব্যবসায়ও ছিল। তিনি বালকটিকে সংবাদবাহকের কাজে নিযুক্ত করলেন। ফ্যারাডের কাজ হল বাড়ী বাড়ী গিয়ে বই-পত্র পৌঁছে দিয়ে আসা। কোনটা হয়ত কাছাকাছি বাড়ী, কোনটা হয়ত দু'মাইল দূরে। এমনি করে সেদিন পথে পথে ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের কিশোর-জীবন অতিবাহিত হয়।

সহসা একদিন সেই কিশোর সংবাদপত্রবাহকের মনে একটা কথা জাগল—লোকের ঘরে ঘরে খবরের কাগজ ফিরি করার চেয়ে, জর্জ্জ রিবোর দফ্‌তরীখানায় কাজ নিলে তো ভাল হয়! অত ঘুরেও বেড়াতে হবে না—আর সবচেয়ে সুবিধের হবে, দফ্‌তরীর কাজের অবকাশে অবকাশে সে তো অনেক বই পড়তে পারবে! সংবাদবাহকের কাজের অবসরে ফ্যারাডে দফ্‌তরীর কাজে শিক্ষানবিশী করতে লাগলেন এবং কিছুকাল পরে জর্জ্জ রিবোকে বলে তিনি দফ্‌তরীর কাজ নিলেন।

দফ্‌তরীদের সঙ্গে ফ্যারাডেও দফ্‌তরীর কাজ করতে লাগলেন। কিন্তু অন্য সব দফ্‌তরী শুধু বইই বাঁধে—ছেঁড়া বই জোড়া দেয়, মেরামত করে—কি বই, কে তার লেখক, কিছুই

তারা দেখা প্রয়োজন মনে করে না। ফ্যারাডে কিন্তু বই পেলেই আগে সেটাকে পড়ে নিতেন। এবং বই বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে তিনি তাঁর নিজের মনকেও বাঁধতে লাগলেন। অপরের ছেঁড়া বই-এর টুক্‌রো মেরামত করতে করতে দারিদ্র্যের রূঢ় হাতে ছেঁড়া তাঁর কিশোর-মনের পাতাগুলোকেও তিনি মেরামত করে নিলেন। দিনের বেলায় বই সারতে, বই বাঁধতে যায়—রাতের অবসরে সেই সব বই পড়েন।

এরি মধ্যে একদিন এক ভদ্রলোক Encyclopaedia Britannica বাঁধাতে দিলেন। অন্যমনস্কভাবে তার পাতা উল্টোতে উল্টোতে 'বিদ্যুৎ' শব্দটার ওপর তাঁর নজর পড়ল। বিদ্যুৎ সম্পর্কে তাতে যা লেখা ছিল, পড়ে ফেললেন। সেইদিন থেকে বিদ্যুল্লতা তাঁর মনকে এক অমোঘ আকর্ষণে বাঁধল। সাত টুক্‌রো দস্তা আর সাতখানা আট-পেনী নিয়ে তাদের মধ্যে জলসিক্ত বস্ত্র দিয়ে Voltaic pile তৈরী করে তিনি নানাবিধ বৈদ্যুতিক পরীক্ষা করতে লাগলেন। সেদিন সেই দফ্‌তরী-খানায় বসে একজন সামান্য দফ্‌তরীর মনে জেগে উঠল বিজ্ঞানের পরম জিজ্ঞাসা,—তারপর, তারপর কি?

সেদিন ফ্যারাডের জীবনে বৈজ্ঞানিকের অন্তরের সেই পরম-জিজ্ঞাসা, মাটির তলা থেকে যেমন করে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে, তেমনি করে মাথা তুলে উঠল। বিজ্ঞানের বই দেখলেই তাকে পড়ে শেষ না করে আর ছাড়েন না।

জর্জ্জ রিবোর গ্রাহকদের মধ্যে অনেকেই এই নতুন ধরণের দফ্‌তরীটিকে লক্ষ্য করেছিলেন। এবং যুবকের জ্ঞানস্পৃহা,

বিনয় এবং মিষ্টভাষণে সকলেই মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তখন ইংলণ্ডে —ইংলণ্ডে কেন সমগ্র য়ুরোপে—স্যার হ্যামফ্রে ডেভির নাম সকলের মুখে মুখে। ইংলণ্ডের তখন তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। ফ্যারাডের অন্তরের নিদারুণ বাসনা যে তাঁর বক্তৃতা শুনবেন। কিন্তু তখনও ইংলণ্ডের লোক বিদ্যুৎ-চর্চ্চাকে ততটা মূল্য দেয় নি। তখনও বিদ্যুতের অঘটন-ঘটন-শক্তির কথা খুব অল্পলোকেই বিশ্বাস করত। সেইজন্য একমাত্র Royal Institution ছাড়া সর্ব্বসাধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার বন্দোবস্ত আর কোথাও ছিল না। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের বিশেষ ছাত্রদের জন্যে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। এখন অবশ্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-প্রচারের জন্যে ইংলণ্ডে অনেক সভা সমিতি স্থাপিত হয়েছে। সাধারণের জন্যে একমাত্র তখন Royal Institution-এ বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। ফ্যারাডের জীবন থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের কি বিশেষ প্রয়োজন! রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউসনে সে-রকম বক্তৃতার ব্যবস্থা না থাকলে জর্জ্জ রিবোর দফ্‌তরীখানা থেকে ইংলণ্ড তার মাইকেল ফ্যারাডেকে পেত না। সুবিধা ও সুযোগ অপব্যয় করে বহু মানুষ—যারা জগতে অসাধারণত্বের জয়টীকা নিয়ে এসেছিল—তারাও সর্ব্ব-সাধারণের সঙ্গে মিশে যায়; আবার সুযোগ ও সুবিধার অভাবে কত ফ্যারাডে, কত দফ্‌তরীখানাতেই জীবন কাটিয়ে দিতে বাধ্য হয়। সেইজন্যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য যে, যাতে সব মানুষ ইচ্ছা করলে সব রকম জ্ঞান অর্জ্জন করতে পারে, তার পথ সর্ব্বদাই খুলে রাখা।

লক্ষ লক্ষ নামহীন লোকের মধ্যে হয়ত এমন একজন জন্মেছেন, যিনি একা জগতের প্রাণ-শক্তির এই বিপুল অপব্যয়কে পুষিয়ে দেবেন—তাঁর জন্যে যেন জ্ঞানের দ্বার সব সময়ে খোলা থাকে।

প্রসঙ্গতঃ এখানে একটা কথার উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের নাম শোনেন নি বাংলাদেশে এরকম শিক্ষিত লোক খুব কমই আছেন। অত বড় ডাক্তার এবং বিজ্ঞানের অত বড় সাধক সে-সময় বাংলা দেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নি। তাঁর মনেও এই কথা জেগেছিল। তাই তিনি সর্ব্বসাধারণ যাতে বিজ্ঞানের বক্তৃতাদি শুনতে পায় সেই-জন্যে Indian Association for the Cultivation of Science প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এবং আজ সেইখান থেকেই স্যার রমন গবেষণা করে বিজ্ঞানের জন্যে নোবেল প্রাইজ পেলেন।

এখন ফ্যারাডের জীবনে আসা যাক। টিকিট না হলে আবার Royal Institution-এ বক্তৃতা শোনা যেত না। মিঃ জোন্‌স্ বলে একজন লোক ফ্যারাডেকে ডেভির বক্তৃতা শোনবার একখানা টিকিট জোগাড় করে দিলেন। মিঃ জোন্‌স্ সেদিন হয়ত জানতেন না যে, এই সামান্য উপকারটির জন্যে সেদিনকার ইংলণ্ডের লক্ষ লক্ষ নগণ্য লোকের মধ্যে তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে রয়ে গেল। আজ ফ্যারাডের নাম করতে গেলেই মিঃ জোন্‌সের নাম এসে যায়।

একখানি খাতা আর পেন্সিল সংগ্রহ করে ফ্যারাডে Royal Institution-এ ঢুকলেন। আমি বেশ বুঝতে পারি, তখন

ফ্যারাডের অন্তরে কি ভাবনা! কত লোক আসছে, গম্ভীরভাবে আসনে গিয়ে তারা বসছে—হয়ত তারা সকলেই যশস্বী, তাদের বই পড়বার ইচ্ছে হলে দফ্‌তরীর কাজ নিতে হয় না। আর কতই না তারা এরমধ্যে সব জেনে ফেলেছে—সে-সব জ্ঞান আয়ত্ত করা এ জীবনে আর কি সম্ভব হবে? আর ঐ যে চেয়ার, ঐখানে বসবেন স্যার হ্যামফ্রে ডেভি—সমস্ত য়ুরোপ তাঁকে সম্মান দেয়। কি সে বিদ্যা, যার কাছে সমগ্র য়ুরোপের মাথা নত?

যুবক আপনার মনে ভাবেন। সহসা তাঁর মনে জাগে—আজ যাঁর নামে য়ুরোপ সম্মান দেয়, সেই ডেভিও তো অতি দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাল্যকালে তাঁরই মতো অল্প লেখাপড়া শিখে তাঁকে এক ডাক্তারের কাছে শিক্ষানবিশী করতে হত। এই শিক্ষানবিশী করতে করতে তিনি পুরোনো ওষুধের শিশি, তামাকের নল এবং পিচকিরি নিয়ে নানা রকমের পরীক্ষা করতে আরম্ভ করেন। কুড়ি বছর বয়সেই তিনি রসায়নে বেশ পারদর্শিতা লাভ করলেন এবং বেডোজ বলে একজন ডাক্তারের সহকারী রূপে চাকরী পেলেন। এইখানে কাজ করতে করতে ডেভি নাইট্রস্‌ অক্‌সাইড্‌ বলে একরকম গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা করতে আরম্ভ করেন। তখন লোকের ধারণা ছিল যে এই গ্যাস মারাত্মক বিষ। কিন্তু বিজ্ঞানসাধক ডেভি এই গ্যাসের ফলাফল সম্বন্ধে সত্যনির্ণয় করবার জন্যে বহুদিন ধরে গবেষণা করছিলেন। একদিন তিনি সেই গ্যাস নিজের ওপর প্রয়োগ করবেন মনস্থ করলেন।

কিছুক্ষণ সেই গ্যাস গ্রহণ করার পরেই ডেভি অজ্ঞান হয়ে

গেলেন। কিন্তু অজ্ঞানাবস্থায় তাঁর মনে হতে লাগল যে, তিনি এখন এক অপরূপ কল্প-রাজ্যে চলে গিয়েছেন, আনন্দে সেখানে বিচরণ করছেন এবং কখনও কখনও খুব জোরে হাসছেন। কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল, তখন তিনি দেখলেন যে তাঁর শরীরে কোন গ্লানি নেই। এই গ্যাস আজ জগতে বিখ্যাত 'হাস্যোদ্দীপক গ্যাস' নামে খ্যাত। তারপর থেকে তাঁর এক একটা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাম কি করে য়ুরোপের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, সমস্তই ফ্যারাডে আপনার মনে ভাবতে লাগলেন। বহু নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করে রসায়নশাস্ত্রে তিনি যুগান্তর আনলেন, কিন্তু মানুষের কল্যাণের দিক থেকে তাঁর সব চেয়ে বড় আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সেফ্‌টী ল্যাম্প। আগে কয়লার খনিতে নানারকমের দাহ্য গ্যাস থাকার দরুণ খনির অন্ধকারে আলো নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক ছিল। এইভাবে আগুন লেগে যাওয়ার দরুণ খনির মধ্যে কত লোক যে প্রাণ দিতে বাধ্য হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এই ল্যাম্প তৈরী করে ডেভি যে কত হতভাগ্য শ্রমিকের জীবন-রক্ষা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

ডেভির বক্তৃতা শুনে ফ্যারাডের চিত্তে সহস্র-শিখায় বিজ্ঞানের রহস্য-অনুসন্ধানের স্পৃহা জেগে উঠল।

বহুদিন চিন্তা করার পর, তাঁর মনের সমস্ত কথা খুলে ডেভিকে তিনি এক পত্র লিখলেন। পত্রে আবেদন করলেন, বিজ্ঞান-শালার শিক্ষানবীশ হিসেবে কোনও চাকরী যদি তাঁকে যোগাড় করে দিতে পারেন।

স্যার হাম্‌ফ্রে ডেভি সেই পত্র পেয়ে তৎক্ষণাৎ ফ্যারাডেকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে দেখলেন যে, যুবকের মনে কি তীব্র জ্ঞানপিপাসা।

দফ্‌তরীখানার কাজ ছেড়ে ফ্যারাডে রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশনের ল্যাবরেটরীতে একজন সাহায্যকারীর চাকরী পেলেন। অবশ্য স্যার ডেভির চেষ্টাতেই। বেতন হোল সপ্তাহে ২৫ শিলিং। তাঁর অসামান্য প্রতিভাগুণে পরে একদিন এই রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউ-শনের সভাপতি তিনি হন।

দু'বছর স্যার হাম্‌ফ্রে ডেভির সঙ্গে য়ুরোপের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রসমূহ ঘুরে এসে ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে বিদ্যুৎ এবং চুম্বক তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর অন্যতম প্রধান গবেষণা প্রকাশ করলেন। সেই তত্ত্ব প্রকাশ হওয়ার ফলেই আজ পৃথিবীর রাস্তায় মোটর, বাস, ট্রাম চলে। সেই তত্ত্ব প্রকাশ হওয়ায় আজ দেশে দেশে অবিরাম ঘর্ঘরধ্বনিতে নানা যন্ত্র মানুষের জন্যে নানা জিনিষ উৎপন্ন করে চলেছে বিদ্যুৎ-চালিত হয়ে।

এই আবিষ্কারের পর দেখতে দেখতে ফ্যারাডের নাম সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। একটার পর একটা আবিষ্কার করে, বিজ্ঞানের জগতে তিনি সত্যিকারের যুগান্তর আনলেন। তাঁর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে শুধু এই কথা জানলেই আমাদের চলবে যে, যাবতীয় বৈজ্ঞানিক এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্র-নির্ম্মাণের মূলসূত্রগুলি তিনি আবিষ্কার করে গিয়েছেন। তাঁর সূত্র অনুসরণ করে বর্ত্তমান জগতের যন্ত্র-সভ্যতা আত্ম-প্রতিষ্ঠ হয়েছে।

জীবনের অতি নিম্নস্তর থেকে আপনার সাধনার বলে তিনি জীবনের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু যশ এবং গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠেও, নিউটনের মত তিনি মানুষ হিসেবে ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ। কত ধনী লোক অর্থের প্রলোভনে তাঁর আবিষ্কার পেটেণ্ট করে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকার সেই সব প্রলোভন তিনি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করতেন। এত মধুর ছিল তাঁর চরিত্র যে, রাস্তায় বেরুলে ছেলেরা তাঁকে ছেঁকে ধরত, তাঁকে ধরে নিয়ে পার্কে বসত। আর জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তিনি, তাদের বিজ্ঞানের গল্প বলতেন। এইভাবে পরিপূর্ণ শান্তি ও গৌরবের মধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়।



[১]

বন্ধু কাশী থেকে চিঠি লিখেছে—

"আমার বড় অসুখ। একবার আসো যদি বড় ভাল হয়। শীগ্‌গির এসো, নইলে দেখা হয়তো না হতেও পারে।"

তাড়াতাড়ি হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে রেলগাড়ীতে চ'ড়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কাশীতে গিয়ে পৌঁছই।

কিন্তু যখন রেলগাড়ী তৈরী হয় নি—তখনকার দিনের কথা একবার ভাবো দেখি! আজকে রেলগাড়ী চড়ে চড়ে আমরা এতদূর অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে, রেলগাড়ী না থাকলে পৃথিবী চলে কি করে, আমরা তা ভাবতেই পারি না। কিন্তু বেশী দিন

আগেকার কথা নয়, একশো বছর আগেও পৃথিবীর কোনও দেশে কোন রেলগাড়ী ছিল না। কিন্তু তবুও সেদিন পৃথিবী চলত।

পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে, নৌকা বেয়ে মানুষ সেদিন চলাফেরা করত। চতুষ্পদ জন্তুরা মানুষের বাহন হয়ে, তার মালপত্র বয়ে বেড়িয়ে সেদিনও পর্য্যন্ত আমাদের সভ্যতাকে চালিয়ে রেখেছিল। আজকে রেলগাড়ীর দিনে, তাদের সেই ঋণের কথা আমরা যেন না ভুলি।—যেন না ভুলি, ঘণ্টায় ষাট মাইল না চল্লেও, একদিন তারাই পিঠে করে মানুষের সভ্যতাকে দেশ-দেশান্তরে নিয়ে বেড়িয়েছে।

[২]

বাষ্প এসে মানুষের অনেক পরিশ্রম দূর করেছে—তার এগিয়ে-চলাকে সে একা অনেকখানি সাহায্য করেছে। তাতে ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, সে-কথা এখানে আলোচনা করে দরকার নেই। তবে একথা সত্যি যে, বাষ্পকে খুঁজে পেয়ে মানুষ এই জগৎকে নতুন করে গড়ে তুলেছে। এত তাড়াতাড়ি, এত বিরাট পরিবর্ত্তন এই জগতের মধ্যে হয়ে গিয়েছে যে, আমরা তার মধ্যে বাস করছি বলে সেই পরিবর্ত্তনের বিরাটত্ব কিছুতেই বুঝতে পারি না।

অথচ এই যে বাষ্পশক্তি, তা চিরকালই মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ছিল। যেদিন আলেকজাণ্ডার বিউকাফেলায় চড়ে গ্রীস থেকে এসেছিলেন ভারতবর্ষে, সেদিনও বাষ্প-শক্তি ছিল; বাষ্প-শক্তি সেদিনও মানুষের অজ্ঞাতে প্রকৃতির রাজ্যে আপনার কাজ করে

চলেছিল। প্রথম মাটির হাঁড়ি তৈরী করে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে যে-মানুষ তার প্রতিদিনের অন্ন প্রথম তৈরী করেছিল, সেও সেদিন সেই বাষ্প-শক্তিরই সাহায্য নিয়েছিল। এই পৃথিবী-ভরা হাজার হাজার উষ্ণ প্রস্রবণে মাটীর বুক থেকে জল টেনে ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে তার অস্তিত্ব জানিয়ে চলেছিল। কিন্তু মানুষ সেদিন তা লক্ষ্য করে নি। বোঝেনি যে, এই শক্তিকে কি করে কাজে লাগাতে পারা যায়।

[৩]

কেউ যে বোঝে নি, অবশ্য একথা বলা চলে না। আলেকজান্দ্রিয়া শহরের নাম তোমরা নিশ্চয়ই জানো। দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার প্রাচীন আফ্রিকার উত্তর উপকূলে তাঁর নিজের নামে এই শহরটির পত্তন করেন। বহু জ্ঞানী গুণী লোক সেই শহরে এসে বসবাস স্থাপন করেন।

জুলিয়াস সীজার যখন রোমে শাসন করতেন, তখন এই আলেকজান্দ্রিয়া শহরে হীরো বলে একজন মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেন। কলকব্জা তৈরী করার ব্যাপারে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ছিল। অনেকে বলেন যে, জ্যামিতির গোড়ার সূত্রগুলি তিনিই প্রথম বার করেন। নীল-নদের বন্যায় চাষীদের ক্ষেত প্রায়ই ডুবে যেতো। বন্যা চলে গেলে এক মহা-বিপদ ঘটতো। দেখা যেতো যে, প্রত্যেকের জমির সীমানা হারিয়ে গিয়েছে। নতুন করে জমির সীমানা মাপবার সময় প্রায়ই গণ্ডগোল ঝগড়া-বিবাদ হতো। জমি মাপবার

জন্যে, জমির সীমানা ঠিক করবার জন্যে হীরো জ্যামিতির সৃষ্টি করলেন।

এই হীরো প্রথম বাষ্প-শক্তির কথা জানতে পারেন। কিন্তু জেনেও তিনি উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাকে কাজে লাগাতে পারলেন না। তখন মিশরে মন্দিরে মন্দিরে পুরোহিতদের খুব আধিপত্য ছিল। অনেক সময় কায়দা করে ভক্ত যাত্রীদের তাঁরা দেবতার অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাতেন। হীরোর প্রথম বাষ্প-চালিত যন্ত্র এই মিশরীয় পুরোহিতরা তাঁদের নিজেদের কাজে লাগান।

সেকালের গ্রীকরা মন্দিরে দেবতার ভোগের জন্যে সুরা দিত। দেবতা সেই সুরা গ্রহণ ক'রে সেটা নিজেই ভক্তদের পাতে ঢেলে দিতেন। এই ব্যাপারটি হীরোর বাষ্পযন্ত্রে ঘটত। ফাঁপা মূর্ত্তির তলায় আগুনের তাপে জলকে বাষ্পে পরিণত করা হত। সেই বাষ্প গিয়ে গলার কাছে সুরায় চাপ দিতে সুরা বেরিয়ে আসত। দেবতা নিজে দিলেন, এই মনে করে সেই প্রসাদ ভক্তরা সানন্দে নিয়ে চলে যেত। জল তোলবার জন্যে বাষ্প-চালিত আর একটি কলও হীরো তৈরী করেন। কিন্তু তারপর বাষ্প-শক্তির কথা আর শোনা যায় না।

[৪]

একজন বিজ্ঞ লোক বলেছেন যে, মানুষের জ্ঞান হ'ল ধূমকেতুর মতো। ধূমকেতুর আবির্ভাবের কথা তোমরা জান বোধ হয়। হঠাৎ একদিন প্রকাশ হ'ল, তারপর বহুশত বৎসর

আর তার কোন দেখা পাওয়া যায় না। আবার হঠাৎ একদিন দেখা গেল। সেই যে জুলিয়াস সীজারের আমলে হীরো বাষ্প-শক্তির ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাকে মানুষের কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন, তারপর প্রায় আঠারো শ' বছর কোন দেশে কোন মানুষ আর বাষ্প-শক্তিকে কাজে লাগাবার কথা ভাবে নি। আঠারো শ' বছর পরে ডেনিস্ প্যাপিন বলে একজন ফরাসী আবার বাষ্প-শক্তিকে কাজে লাগালেন।

প্যাপিনের কথা বলবার আগে, বাষ্প-চালিত এঞ্জিনের যে দুটি হল বিশেষ অংশ তার সম্বন্ধে মোটামুটি দু'একটা কথা বলা দরকার। যে-কোনও বাষ্প-চালিত এঞ্জিনের দুটি প্রধান অংশ হল, সিলিণ্ডার এবং পিষ্টন। সিলিণ্ডারগুলো সাধারণতঃ গোল এবং ফাঁপা হয়। সিলিণ্ডারের সঙ্গে লম্বা দণ্ডের মত পিষ্টন আটকান থাকে। বাষ্পের চাপে পিষ্টন সিলিণ্ডারের মধ্যে যাওয়া-আসা করার ফলে যন্ত্র চলে। এই সিলিণ্ডার এবং পিষ্টনের ব্যাপার আবিষ্কৃত না হলে কোন বাষ্প-যন্ত্রই তৈরী হত না। হীরো সিলিণ্ডার এবং পিষ্টনের কথা ভাবতে পারেন নি। প্যাপিন এই দুটি অপরিহার্য্য জিনিষের কথা জগৎকে প্রথম জানিয়ে বাষ্পযন্ত্র তৈরী করার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে গেলেন।

[৫]

সম্ভবতঃ ১৬৪৭ থেকে ১৭১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্যাপিন জীবিত ছিলেন। স্বাধীন ধর্ম্মমত প্রকাশের জন্য তখন য়ুরোপে

নানা রকমের ঝগড়াঝাঁটি চলত। লোকে ভীষণ ভাবে নির্য্যাতিত হত। প্যাপিনও এইভাবে নিজের দেশে নির্য্যাতিত হন। তাঁর ধর্ম্ম-মতের জন্যে নির্য্যাতিত হয়ে প্যাপিন স্বদেশ ছেড়ে ইংলণ্ডে পালিয়ে আসেন। ইংলণ্ডে এসে তিনি সিলিণ্ডার এবং পিষ্টন-ওয়ালা প্রথম বাষ্পযন্ত্র তৈরী করলেন। অবশ্য তাঁর সিলিণ্ডার এবং পিষ্টনের গঠনের অনেক ত্রুটি ছিল, কিন্তু তাঁর বাহাদুরি হল যে, যে-দুটো জিনিষ না হলে বাষ্পযন্ত্র তৈরী হত না, তিনি প্রথমে সেই দুটি জিনিষের রূপ শুধু কল্পনা করলেন তা নয়, তাকে বাস্তবেও রূপ দিলেন।

প্যাপিন বাষ্পশক্তি দিয়ে আর একটি মজার জিনিষ তৈরী করেন। Papin's Digest নামে সে-যন্ত্রটি বায়ুশক্তির ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। বাষ্পের সাহায্যে তাড়াতাড়ি রান্না করবার জন্যে তিনি এই যন্ত্রটি তৈরী করেন। এই নতুন যন্ত্রে রান্না ক'রে বিখ্যাত রয়েল সোসাইটির সভ্যদের তিনি নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। বায়ুর উত্তাপে মাংস এ-রকম রান্না হয়েছিল যে হাড়গুলো পর্য্যন্ত একেবারে গলে গিয়েছিল।

জন এভেলিন বলে একজন ইংরাজের সেই সময়কার লেখা একটা ডায়েরী আছে। এই বিখ্যাত নিমন্ত্রণের তিনি একটা বর্ণনা রেখে গিয়েছেন। তিনি এই নিমন্ত্রণ ব্যাপারের বর্ণনায় খাদ্যের এবং রান্নার যে-রকম বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে এই আবিষ্কারের কথা তলিয়ে গিয়েছে। প্যাপিনের নতুন যন্ত্রটির একটা বিশেষত্ব ছিল। প্যাপিন এই যন্ত্রে আর একটি নতুন অঙ্গ জুড়েছিলেন। বাড়তি বাষ্পকে চালিয়ে দেবার জন্যে এঞ্জিনে

যে ভাল্‌বের প্রয়োজন হয়, তিনি প্রথম এই ব্যাপার উপলক্ষে তা তৈরী করেন। সেদিনকার সেই ঐতিহাসিক নিমন্ত্রণের মধ্যে সমস্ত রান্নার চেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল, এই ভাল্‌বের সৃষ্টি।

তা হলে, একথা বলা যেতে পারে, বর্ত্তমান বাষ্পযন্ত্রের জনক হিসাবে এই ফরাসী নির্ব্বাসিতের নামই উল্লেখ করা উচিত। বাষ্পযন্ত্রের যা প্রধান অঙ্গ, সিলিণ্ডার, পিষ্টন এবং ভাল্‌ভ্‌—এই তিনটিই প্যাপিনের দান।

[৬]

বাষ্পযন্ত্রের ইতিহাসে প্যাপিনের নামের পর টমাস নিউ-কমনের নাম করতে হয়। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে ডার্টমাউথে এক দরিদ্র পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে নিউকমন তালা চাবির কাজ করতেন। জন্ম থেকেই যন্ত্র গড়বার তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল।

সেই সময় ইংলণ্ডে কয়লার খনি খোঁড়ার কাজ খুব জোরে চল্‌ছে। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হয়েই দেখা গেল যে, এক মহাবিপত্তি ঘট্‌ছে। খনিতে এত জল জমে যে, খোঁড়ার কাজ আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। বালতি করে কত আর জল তোলা যায়?

সহজে খনি থেকে কি করে জল তোলা যায়, তখন অনেকেই এই কথা ভাবছিলেন। নিউকমনও এই ব্যাপার নিয়ে অনেক-দিন ধরে ভাবতে থাকেন। অবশেষে তিনি বাষ্পচালিত

একটা যন্ত্র তৈরী করলেন—তার সাহায্যে পাম্প করে খনি থেকে জল তোলা যেত। সেই যন্ত্র তৈরী করার পর নিউকমনের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বহু খনিতে তাঁর যন্ত্র ব্যবহৃত হতে লাগল।

পরের যুগে যাঁরা রেলগাড়ী তৈরী করলেন তাঁরা নিউকমনের এই যন্ত্র থেকেই প্রেরণা পান।

[৭]

জেম্‌স্ ওয়াট্ এবং তাঁর চায়ের কেট্‌লির গল্প তোমরা জান। জেম্‌স্ ওয়াট্ যৌবনে একবার একটা পুরোণো নিউকমনের যন্ত্র মেরামত করবার জন্যে পান। সেই যন্ত্রটিকে নিয়ে দিনের পর দিন তিনি তন্ন-তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখেন এবং বহু দিনের চেষ্টার ফলে বায়ু-চালিত যন্ত্র নির্ম্মাণ করলেন। ওয়াটের যন্ত্র রীতিমত কার্য্যকরী হয়ে উঠল। অবশ্য তখন তিনি যে সব বাষ্পচালিত যন্ত্র তৈরী করতে লাগলেন সেগুলো সবই কিন্তু স্থাণু, সচল নয়। অর্থাৎ রেলগাড়ী তৈরী করার কথা তখনও কারুর মনে আসে নি। এইবার একটি অদ্ভুত লোকের কথা বলব—তাঁর নাম রেলগাড়ী তৈরীর ইতিহাসে সকলের ওপর থাকা উচিত ছিল, কিন্তু দৈবযোগে তা ঘটে নি।

তাঁর নাম হল উইলিয়াম মারডক্। স্কটল্যাণ্ডে আয়ার-সায়ার গ্রামে ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছেলে-বেলায় কোনও লেখাপড়া তিনি শেখেন নি। পাহাড়ে পাহাড়ে গরু চরাতেন ; বিশ্রাম করবার সময় পাহাড় খুঁড়ে গর্ত্ত তৈরী

করতেন। সেই গর্তে কয়লা নিয়ে এসে আগুন ধরাতেন। এই ছিল তাঁর খেলা। এবং এই খেলা থেকেই কয়লার গ্যাসের খবর তিনি জগৎকে দিলেন। মানুষ একটা নতুন শক্তির সন্ধান পেল। বারমিঙহাম আর মাঞ্চেষ্টার কেরোসিনের আলোর বদলে গ্যাসের আলোয় ভরে উঠল।

স্কটল্যাণ্ডে থাকতে আর তাঁর ভাল লাগছিল না। তাঁর প্রায়ই মনে হত যে, উপযুক্ত সহায় পেলে অনেক নতুন জিনিস তিনি তৈরী করে যেতে পারেন। সকলের চেয়ে বেশী করে তাঁর মনে হত যে, বাষ্প



১। উপরে, চায়ের টেবিলে জেমস্ ওয়াট্, ২। মাঝে, উইলিয়াম মারডক্, ৩। নীচে, ক্যাপটেন ট্রেভিথিক

দিয়ে তিনি সচল যন্ত্র তৈরী করতে পারেন। সচল রেল-এঞ্জিন তৈরী করবার কথা ভীষণ ভাবে তাঁর মনকে পেয়ে বসে।

অন্তরের বাসনাকে রূপ দেবার জন্যে পায়ে হেঁটে তিনি বারমিঙহামে এলেন। সেখানে তখন জেম্‌স্ ওয়াট্ এবং তাঁর বন্ধু বোল্‌টনের বিখ্যাত কারখানা ছিল। এই কারখানা থেকেই ওয়াটের সমস্ত যন্ত্র তৈরী হত। মারডকের সঙ্গে দেখা হল বোল্‌টনের।

সচল বাষ্পযন্ত্রের কথা শুনে বোল্‌টন হেসে উড়িয়ে দিলেন। এতদূর পথ এসে, এরকম ভাবে অবজ্ঞাত হয়ে ক্ষোভে মারডক্ তাঁর মাথার টুপিটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেললেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের ব্যাপার, একটা খুব ভারী আর শক্ত জিনিস মাটিতে পড়লে যেমন শব্দ হয়, টুপিটা মাটিতে পড়তেই তেমনি শব্দ হল।

বোল্‌টন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, একি, টুপিটা কিসের তৈরী হে ?

দুঃখিত ভাবে মারডক্ উত্তর দিল, কাঠের, স্যার ! নিজের হাতে মতলব করে তৈরী করেছিলাম।

এই ব্যাপারে বোল্‌টন এতদূর চমৎকৃত হন যে, তিনি সেই-দিনই মারডক্‌কে সপ্তাহে পনেরো শিলিং করে মাইনের একটা চাকরী দিলেন।

সেই কোম্পানীতে চাকরী করবার সময় মারডক্ সত্য সত্যই জগতের প্রথম রেল-এঞ্জিন তৈরী করেন। এঞ্জিনটি যদিও আকারে ছোট ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাস্তা দিয়ে সেটা চলেছিল। কিন্তু মাত্র এক রাত্তিরের জন্যে। জগতের সেই প্রথম রেল-

এঞ্জিন মাত্র এক রাত্তিরের জন্যে চলেছিল। কিন্তু তাতেও কি বিপত্তি!

রেড্‌রুথ গ্রামে একদিন রাত্রিবেলা যখন সবাই ঘুমিয়ে আছে, মারডক্ তাঁর ছোট্ট রেল-এঞ্জিনটি নিয়ে নির্জ্জন রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। প্রথম এঞ্জিন, দোষ তার ছিল অসংখ্য! চোঙা দিয়ে কয়লার লাল আগুন নির্জ্জন অন্ধকারকে সশব্দে রাঙিয়ে তুলল। গৃহস্থরা ঘুমের মধ্যে হঠাৎ সেই অদ্ভুত ধরণের শব্দ শুনে, জানালা খুলে বাইরে চেয়ে দেখে, শব্দ করে একটা আগুনের শিখা চলেছে! তারা ভাবল, নিশ্চয়ই ভূতের কাণ্ড! সে-সময়ের ইংলণ্ডের আনাচে কানাচে ভূত ঘুরে বেড়াত। সভয়ে তারা ভগবানের নাম স্মরণ করতে লাগল।

গির্জ্জার সামনে যখন এঞ্জিনটা এল, পাদ্রীর গেল ঘুম ভেঙ্গে। জানালার বাইরে দেখেন, শয়তান মশাল জ্বেলে পথ দিয়ে চলেছে!

পরের দিন ভোর বেলা, হৈ হৈ কাণ্ড পড়ে গেল। কিন্তু যখন তারা জানল যে মারডক্‌ও সেই সঙ্গে ছিল, তখন সবাই ঘোষণা করল যে, মারডকের ঘাড়ে নিশ্চয়ই শয়তান ভর করেছে!

মারডক্ বিব্রত হয়ে বোল্‌টনের শরণাপন্ন হলেন, কিন্তু বোল্‌টন তাঁর প্রস্তাব অসম্ভব বলে প্রত্যাখ্যান করলেন। মারডকের আর রেলগাড়ী তৈরী করা হল না। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অপূর্ণ বাসনা নিয়েই পরলোক গমন করলেন।

[৮]

মারডক্ যে-গ্রামে তাঁর প্রথম রেল-এঞ্জিন চালিয়েছিলেন সেই গ্রামেই রিচার্ড ট্রেভিথিক বলে একটি ছেলে ছিল। ছেলেবেলা থেকেই যন্ত্রপাতি তৈরী করার দিকে তারও মন ঝোঁকে। স্কুলে পড়বার সময় সে প্রায়ই ভাবত, কি রকম করে বাষ্পশক্তিকে কাজে লাগান যায়। মারডকের কাহিনী সে শুনেছিল। সর্ব্বদাই ভাবত মারডকের কল্পনাকে কি করে সফল, সার্থক করা যায়। বাষ্পশক্তি দিয়ে গাড়ী চালাতেই হবে।

পাঁচশ বছর বয়সে তিনি একটি ছোট এঞ্জিন তৈরী করলেন। নিজের বাড়ীতে একটা টেবিলের উপর সেটা চালালেন। একটা ছোট্ট খেলাঘরের এঞ্জিন, কিন্তু সেটা সত্যিই চল্ল!

উৎসাহিত হয়ে তিনি একটা বড় এঞ্জিন তৈরী করে সেটাকে লণ্ডনে নিয়ে এলেন। এঞ্জিনের সঙ্গে একটা ছোট্ট গাড়ী জুড়ে দিলেন। প্রথমে সে গাড়ীতে উঠতে লোকে ভয় পেল। মালপত্র নিয়ে ট্রেভিথিকের রেলগাড়ী দিব্যি চলতে লাগল। ক্রমশঃ তাতে লোকজন উঠতে লাগল। স্যার হাম্‌ফ্রে ডেভি—সে সময়ের সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক—তাঁর একজন বন্ধুকে এই ব্যাপার সম্বন্ধে চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে তিনি এই রেল-গাড়ীটির উল্লেখ করে লেখেন, ক্যাপ্টেন ট্রেভিথিকের ড্রাগন!

পেন্-ই-ডারান্ বলে একটা জায়গায় একটা লোহার কারখানা ছিল। সেই কারখানার সঙ্গে কয়েক মাইল লম্বা একটা ট্রাম-লাইন ছিল। ট্রেভিথিক সেই ট্রাম-লাইনের ওপর একটি আসল রেল গাড়ী তৈরী করে চালালেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী, দশ টন লোহা আর সত্তর জন যাত্রী নিয়ে গাড়ী ছাড়ল। ঘণ্টায় পাঁচ মাইল হিসাবে গাড়ীটা চমৎকার চলতে লাগল। কিন্তু এক জায়গায় ট্রাম-লাইনটা একটু খারাপ থাকায় এঞ্জিনটা লাইন থেকে পড়ে গেল। এবং দুর্ঘটনার পরে সেবারকার মত ট্রাম-লাইনে এঞ্জিন চলা বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু ট্রেভিথিক তাতে দমলেন না। লাইন ছাড়া বাষ্প-চালিত একটা গাড়ী তৈরী করে তিনি লণ্ডনে চালাতে লাগলেন।

তাঁর অর্থসঙ্গতি খুব বেশী ছিল না। তার ওপর বার বার রেলগাড়ীর জন্যে এঞ্জিন তৈরী করার ব্যাপারে তাঁর প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হয়। তিনি ভাবলেন যে, এই যাত্রী-গাড়ীর ব্যবসায়ে তিনি ক্ষতিপূরণ করে নেবেন কিন্তু ক্ষতির মাত্রা আরও বেড়ে গেল। নানাকারণে তাঁর গাড়ীতে লোকজন বিশেষ হল না। এদিকে ট্রেভিথিক ক্রমশঃ নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। অবস্থা ক্রমশঃ এত খারাপ হয়ে দাঁড়ায় যে যখন ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহ রক্ষা করলেন, তখন তাঁর দেহ সমাহিত করবারও টাকা ছিল না। বন্ধুরা চাঁদা করে তাঁর দেহ সমাহিত করেন।

[৯]

নিউকাসেলের কাছে একটি ছোট্ট গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জর্জ্জ ষ্টিফেনসন বলে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। ভাই বোনে মিলে তাঁরা ছ'জন ছিলেন। একটিমাত্র ছোট ঘর। সেই ঘরে তাঁরা সকলে কোনও মতে থাকতেন।

ষ্টিফেনসনের বাবা কারখানায় সামান্য মজুরের কাজ করতেন। ছেলেমেয়েদের বর্ণ-পরিচয় শেখাবার মত সামর্থ্যও তাঁর ছিল না। তাই একটু বয়স হতেই জর্জ্জ ষ্টিফেনসনকে একটা কয়লার খনিতে মুটেগিরি করে পয়সা অর্জ্জন করতে হত।

আঠার বছর বয়সে দিনের বেলা বারঘণ্টা খেটে রাত্রি-বেলায় একটা পাঠশালায় গিয়ে জর্জ্জ এ-বি-সি-ডি শিখতে আরম্ভ করলেন। একুশ বছর বয়সে কোন রকমে মাত্র নাম সই করতে শিখলেন।

নানারকম কাজ করে জর্জ্জকে পয়সা উপায় করতে হত। জুতো সেলাই করে, মুচীর "লাস" তৈরী করে, ঘড়ি মেরামত করে, মুটেগিরী করে তিনি অর্থ উপার্জ্জন করতেন। কিন্তু তাঁর একটা বিশেষত্ব ছিল যে, যে-কোনও যন্ত্র মেরামত করতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

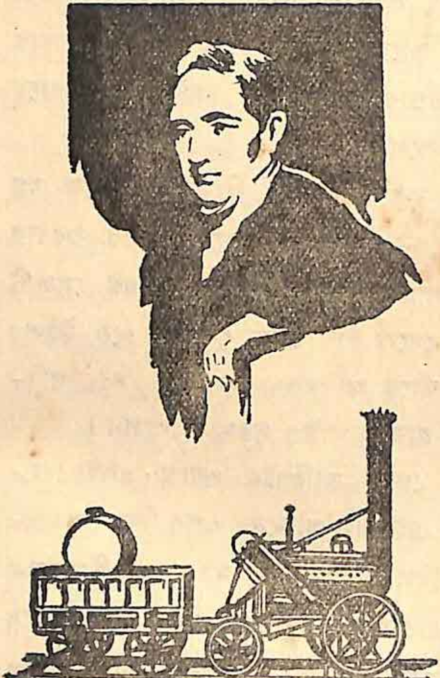
যে-লোক জগতে রেলগাড়ী আনল তিনি যৌবন পর্য্যন্ত লেখা-পড়া কিছুই শেখেন নি—বিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব তিনি জানতেন না। কিন্তু যন্ত্রকে তিনি ভালবাসতেন। সে-সময় যত যন্ত্র তৈরী হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিকে তিনি ভাল করে জানতেন। সেইজন্যে যন্ত্র মেরামতের কাজে তিনি ওস্তাদ হয়ে উঠলেন।

সপ্তাহে উনিশ শিলিং হিসাবে তিনি একটা ভাল চাকরী পেলেন। কাজ হল ভাঙ্গা যন্ত্র মেরামত করা। এই সময় একটা কয়লার খনিতে জলতোলা কল খারাপ হয়ে যায়। কেউ আর তাকে সারাতে পারে না। শেষে খনির মালিকরা ষ্টিফেনসনকে ডেকে পাঠালেন। তখন খনির এমন তুরবস্থা যে

সেটা জলে ডুবে যাবার উপক্রম হয়েছে। ষ্টিফেনসন এসে যন্ত্রটি ভালো করে দেখে তাকে মেরামত তো করলেনই, তার উপর একটা নতুন সিলিণ্ডার জুড়ে দিয়ে যন্ত্রটাকে একেবারে নতুন রকম করে গড়ে তুললেন।

যন্ত্র মেরামত করতে করতে ক্রমশঃ ষ্টিফেনসন নিজে যন্ত্র তৈরী করতে আরম্ভ করলেন। খনির ভেতরে ব্যবহার করবার জন্যে একটা সেফ্‌টি ল্যাম্প তৈরী করলেন। এই সেফ্‌টি ল্যাম্প তৈরী করার পর থেকে তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে উঠল। বহু সম্ভ্রান্ত লোক মিলে তাঁকে অভিনন্দন দিল এবং সেই অভিনন্দনের সঙ্গে তিনি এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পেলেন।

সেই সময় ষ্টকটন থেকে ডার্লিংটন পর্য্যন্ত একটা রেল-লাইন খোলা হচ্ছিল। এই রেল-লাইনের ওপর দিয়ে ঘোড়ায়-টানা গাড়ী যাবে এই ছিল কোম্পানীর মতলব। ষ্টিফেনসন এই কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হন এবং তিনি কোম্পানীর মালিক এডওয়ার্ড পীসকে বোঝাতে লাগলেন যে, ঘোড়ায় টানা গাড়ীর বদলে বাষ্পচালিত এঞ্জিনের ব্যবস্থা করা উচিত। বহুকষ্টে তিনি পীসের মত করালেন এবং চার বছর ধরে বহু ভাঙ্গা-গড়ার পর ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ষ্টকটন-ডারলিংটন রেলওয়ে খোলা হল। এঞ্জিনের সঙ্গে ছ'খানা গাড়ী জোড়া হল। পাঁচখানা গাড়ীতে মাল বোঝাই হল, শুধু একটা গাড়ীতে মাত্র জন কয়েক যাত্রী উঠল। যখন সেই গাড়ী আবার ষ্টকটন থেকে ফিরে এল, তখন তার যাত্রীর সংখ্যা ছ'শো।



১। জর্জ্জ ষ্টিফেনসন, ২। জর্জ্জ টিফেনসনের 'রকেট'

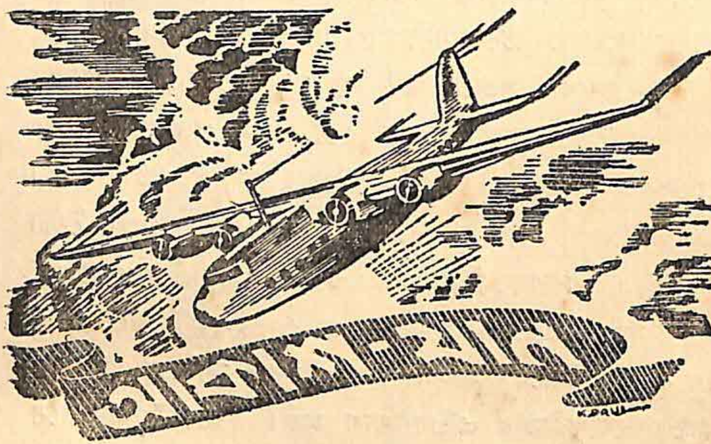
ষ্টিফেনসনের জীবনে সে এক অপূর্ব্ব দিন! বহু যুগের স্বপ্ন সেদিন সফল হল। জগতের ইতিহাসে সীজার, নেপোলিয়ান যে পরিবর্ত্তন আনতে পারেন নি, একজন সামান্য কুলির ছেলে সেদিন জগতে সেই মহাযুগান্তর আনল। ষ্টিফেনসন ঠিক করলেন লিভার-পুল থেকে মাঞ্চেষ্টার পর্য্যন্ত রেল-লাইন খুলবেন। কিন্তু দেশের লোকে যখন এই সংবাদ শুনল, তখন সকলে ক্ষেপে উঠল। এমন কি পার্লামেণ্টের সভ্যরা ষ্টিফেনসনের প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করলেন—লোকটা কি প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার করতে চলেছে! এঞ্জিনের আগুন থেকে গ্রামে আগুন লেগে যাবে, গরু-বাছুর চলতে পারবে না, দুধে বিষাক্ত জিনিষ উড়ে এসে পড়বে, শিকার করবার জন্যে খেঁকশিয়াল একটিও আর থাকবে না—এ কখনই হতে পারে না। একি বিপর্য্যয় কাণ্ড! সেদিন

যাতে রেল-লাইন না বসে, তার জন্যে ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকেরা এই সব যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন এবং গ্রামের লোকেরা গোপনে ষ্টিফেনসনকে হত্যা করবারও চেষ্টা করে।

পার্লামেণ্টের সভ্যদের মত করাতে ষ্টিফেনসনকে অসাধ্য সাধন করতে হয়েছিল। বহু কষ্টে তিনি পার্লামেণ্টের মত পেলেন। লিভারপুল থেকে মাঞ্চেষ্টার পর্য্যন্ত লাইন বসল। এই লাইনে চালাবার জন্য "রকেট" বলে একটা এঞ্জিন তৈরী করলেন। পরীক্ষার দিন রকেট ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে ছুটল।

সে-সময় রেলের এঞ্জিনের পরীক্ষা বড় ভীষণ ছিল। ঘণ্টায় দশ মাইল হিসাবে তু'মাইল পথ কুড়ি বার নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করলে তবে পরীক্ষায় এঞ্জিন পাশ হত। "রকেট" অনায়াসে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল।

এই ব্যাপারের পর থেকে ষ্টিফেনসনের নাম য়ুরোপের সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ল। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁর কাছে রেলওয়ে এঞ্জিন তৈরী করে দেবার আহ্বান আসতে লাগল। এবং জর্জ্জ ষ্টিফেনসন পৃথিবীকে ঘণ্টায় ষাট মাইল হিসেবে চলতে শেখালেন। একশো বছরের মধ্যে জর্জ্জ ষ্টিফেনসনের কল এত-বড় পুরোণো পৃথিবীর চেহারা আমূল বদলে দিল। শুধু তাড়াতাড়ি যাওয়ার দিক থেকে নয়, মানুষের খাওয়া-দাওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য, ওঠা-বসা, ভয়-ভাবনা সকল দিক দিয়েই এই রেলগাড়ী যে কি পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে—তোমরা বড় হয়ে তা বুঝতে পারবে।



খুব বেশীদিন আগেকার কথা নয়। জগতে প্রথম রেলগাড়ী চলে, ১৮২৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর। ইংলণ্ডের ষ্টকটন নগর হইতে ডার্লিংটন পর্য্যন্ত প্রথম রেল-লাইন পাতা হয়। এই লাইনের উপর দিয়া জর্জ্জ ষ্টিফেনসন সেদিন জগতে প্রথম ৪০ জন যাত্রী লইয়া ঘণ্টায় ১২ মাইল হিসাবে রেল-ইঞ্জিন চালান। এই ব্যাপারের কয়েক বছর আগে আমেরিকায় ফুল্‌টন নামে একজন ইঞ্জিনীয়ার বাষ্পের সাহায্যে নদীর জলে বোট চালান। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট চল্লিশ জন যাত্রী লইয়া ফুল্‌টনের ষ্টীমার হাড্‌সন্ নদীর উপর দিয়া আলবেনীতে আসিয়া পৌঁছায়। সেই হইল জগতের প্রথম যাত্রী-ষ্টীমার। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত

ষ্টীমার সমুদ্রের এ-পার ও-পার হইতে পারে নাই। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে গ্রেটওয়েষ্টার্ণ এবং সিরিয়াস নামে দুইখানি বায়ু-চালিত জাহাজ ইংলণ্ডের কূল ত্যাগ করিয়া প্রথম আটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে আসিয়া পৌঁছায়। কয়েক বছর আগেও এমন অনেক বৃদ্ধ লোক জীবিত ছিলেন যাঁহারা বর্ত্তমান যুগের এই দুই আশ্চর্য্য সৃষ্টিকে তাঁহাদের চোখের সামনে জন্মাইতে দেখিয়াছেন।

কিন্তু এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের এই দুই অপরূপ সৃষ্টি দুনিয়ায় যে কি পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে, তাহার ব্যাপকতা আমরা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। একশ' বছর আগে যদি কাহাকেও কুড়ি মাইল দূরের গ্রামে যাইতে হইত, তাহা হইলে বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনেরা গোপনে অশ্রু জল ফেলিত। কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান যাইতে হইলে লোকে উইল অছিয়ৎ করিয়া রাখিয়া পথে বাহির হইত। আজ বর্দ্ধমান হইতে লোকে ডেলী-প্যাসেঞ্জারী করিতেছে। জার্ম্মানীর বার্লিন হইতে হামবুর্গ শহরের দূরত্ব হইল ১৭৮ মাইল। এই ১৭৮ মাইল পথ রেলে দু'ঘণ্টা কয়েক মিনিটের মধ্যে মানুষ উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং দিনের মধ্যে লোকে এই দুই প্রধান শহরের মধ্যে তিন-চারবার করিয়া যাতায়াত করিতে পারে। এই রেল-লাইনে যে এঞ্জিন চলে তাহা ঘণ্টায় ৭৭ মাইল যায়। আমেরিকার চিকাগো শহর হইতে ওমাহা পর্য্যন্ত ১০১৫ মাইল পথ, অর্থাৎ আমাদের এখানে ধরুন, কলিকাতা হইতে আম্বালা পর্য্যন্ত, মাত্র ১৩ ঘণ্টার মধ্যে অতিক্রম করা যায়।

অথচ একশ' বছর আগে প্রথম যেদিন জর্জ্জ ষ্টিফেনসন ঘণ্টায় ১২ মাইল হিসাবে এঞ্জিন চালান, তখন ইংলণ্ডের লোকেরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইংলণ্ডের বহু সম্ভ্রান্ত লোক, সমবেত-ভাবে পার্লামেণ্টে এক দরখাস্ত করিলেন যে, এই মারাত্মক দ্রুত-গতিতে যদি গ্রামের মধ্য দিয়া রেল যায়, তাহা হইলে গরুবাছুর একটিও বাঁচিয়া থাকিবে না। আমাদের দেহের মধ্যে যেমন শিরা-উপশিরা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে তেমনি আজ সর্ব্বদেশে লোহার এই রেলপথ সর্ব্বস্থলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সাত দিনের জন্য যদি জগতের সমস্ত এঞ্জিন অচল হইয়া যায়, তাহা হইলে যে কি অবস্থা হইতে পারে, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান এবং কল্পনাশীল লোকেও তাহা সম্যক্‌রূপে ভাবিতে পারেন না।

পুত্র প্রবাসে অসুস্থ। পিতা তাহাকে দেখিতে যাইবার জন্য ব্যাকুল। রেল নাই। অগত্যা পিতা কখনও নৌকায়, কখনও পায়ে হাঁটিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন—কত দিনে তিনি অসুস্থ পুত্রের শয্যার পার্শ্বে পৌঁছিবেন?

কৃষক মাস ভরিয়া শস্য সঞ্চয় করিয়াছে—কাল শহরের হাটে যাইবে। রাত্রিবেলায় আদর করিয়া সে তাহার স্ত্রীকে বলিয়াছে সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিয়াই হরি স্যাকরার নিকট হইতে বাজুটি ছাড়াইয়া আনিবে। সকালে মালপত্র লইয়া ষ্টেশনে আসিয়া শুনিল, এঞ্জিন সাতদিন চলিবে না। দশ টাকার জিনিষ সেই মুহূর্ত্তে তাহার এক টাকার চেয়েও কম দাম হইয়া গেল। কাঁচা মাল মজুদও রাখা যায় না। কাঁচা মাল যদি বা থাকে, খালি পেট

কতক্ষণ শূন্য থাকিবে ? হরি স্যাকরার সিন্ধুকের বাজু কৃষক-রমণীর হাতে উঠিবে কি ?

আসামে জল-প্লাবন হইয়াছে। এক মুঠো অন্নের জন্যে লোকে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের জন্য কলিকাতায় হাজার মণ চাল সংগৃহীত হইয়াছে। সে চাল কে পৌঁছাইয়া দিবে ? রেল বা ষ্টীমার ছাড়া যে উপায়ে পৌঁছাইতে পারা যায় সে উপায়ে যখন সেখানে সাহায্য গিয়া পৌঁছাইবে, তখন সাহায্য লইবার জন্য কয়জন জীবিত থাকিবে ?

স্বামী বিদেশে অসুস্থ, বিপন্ন। স্ত্রী পত্র লিখিয়াছেন, কেমন আছ, শীঘ্রই জানাইবে। স্বামীর উত্তর কে লইয়া আসিবে ? পিয়ন আসিতেছে মনে করিয়া স্ত্রীর মন হয়ত দরজার দিকে চাহিয়া জাগিয়া থাকিবে, কিন্তু রেল না চলিলে, পিয়ন কোথা হইতে উত্তর লইয়া আসিবে ? কত দিন তাহাকে এমনি চাহিয়া থাকিতে হইবে ?

এমনিভাবে চিত্রের পর চিত্র বাড়াইয়া চলা যায়। আমাদের প্রতিদিনের প্রতিকাজের সহিত এমন স্বাভাবিকভাবে রেল ও ষ্টীমার জড়াইয়া গিয়াছে যে, ভাল হক, মন্দ হক, তাহার সহিত সম্পর্ক আর ছাড়াইতে পারি না। লোহা আর কয়লার সঙ্গে আমাদের জন্মগত সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া গিয়াছে।

সমুদ্র আর স্থল-পথ ষ্টীমার এবং রেলের সাহায্যে এইভাবে জয় করিয়াও মানুষের মন ক্ষান্ত হইতে পারে নাই। রেল বা ষ্টীমার সর্ব্বত্র যাইতে পারে না। সমুদ্রের যেখানে তটভূমি সেইখানেই ষ্টীমারের শক্তির শেষ। জল ব্যতীত তাহার যাইবার

পথ নাই। রেল-এঞ্জিনের জন্যও চাই লোহা-বাঁধান পথ, এমনি পথে সে যাইতে পারে না। পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র, মরুভূমি, জনাকীর্ণ পথ—বিস্তর তাহার বাধা। পৃথিবীর রাজপথে প্রতিদিনই এত ভিড় বাড়িয়া যাইতেছে—সেখান দিয়া দ্রুত রেল চালান মারাত্মক ব্যাপার। তাই লণ্ডন, প্যারী, নিউইয়র্ক প্রভৃতি জগতের বড় বড় শহরে মাটির নীচে রেল চলিতেছে। আমেরিকায় পায়ে-চলা রাস্তার উপরেও রেল-পথ তৈয়ারী হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে শুধু ভিড়ই বাড়িয়া চলিয়াছে।

এইভাবে মানুষের দৃষ্টি আকাশ-পথের উপর গিয়া পড়িল। মাথার উপরে অবারিত এই তো মহাশূন্যস্থল রহিয়াছে। সেখানে কোনও মানুষের ভিড় নাই, কোনও সাগরের ব্যবধান নাই, কোনও পর্ব্বতের বাধা নাই। সাগর, মরুভূমি, পাহাড়ের উপর দিয়া বাধাহীন একটানা এই তো একমাত্র পথ! সেই অভিনব রাজপথের যাহারা একমাত্র যাত্রী, ডানা মেলিয়া তাহারা কিভাবে শূন্যে বিচরণ করে, মানুষ দিনের পর দিন তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিল। বিশ্বরাজের এই বিরাট্-রাজত্বে কখন তিনি কাহাকে দিয়া কি শিক্ষা দেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। আজ যাহাকে মনে হইয়াছে নগণ্য, কাল দেখি তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া জগৎব্যাপী এক মহা সৃষ্টি গড়িয়া উঠিল। তুচ্ছ মাটি-কাটা কীট, তাহার কার্য্য দেখিয়া ব্রুনেল পাহাড় কাটিয়া সুড়ঙ্গ তৈয়ার করিবার নির্দ্দেশ খুঁজিয়া পাইলেন। সামান্য আকাশচারী বিহঙ্গ মানুষকে এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময়কর সৃষ্টি গড়িয়া তুলিবার পন্থা শিক্ষা দিল।

পাখীর ডানার ভঙ্গি, তাহার উড়িবার কায়দা দিনের পর দিন লক্ষ্য করিয়া মানুষ আকাশপথের জন্য এরোপ্লেন তৈয়ারী করিবার ইঙ্গিত খুঁজিয়া পাইল।

ষ্টীমার, মোটর, রেলগাড়ী এবং উড়োজাহাজের মধ্যে উড়োজাহাজই সকলের চেয়ে নবাগত। প্রকৃতপক্ষে উড়োজাহাজের বয়স ৪০ বছরও হয় নাই। এরোপ্লেনের বয়স তো আরও কম। মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়, তখন এরোপ্লেনের সবেমাত্র জন্ম হইয়াছে এবং সেই সময়ই বোঝা গেল যে, এই নব আবিষ্কার মানুষের সমস্ত যুদ্ধরীতি সম্পূর্ণভাবে বদলাইয়া দিবে। জার্ম্মাণ উড়োজাহাজের আক্রমণের আশঙ্কায় লণ্ডন শহরের লোকেরা দিনের পর দিন কি আতঙ্কেই না দিন কাটাইয়াছে! এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই বিমান আক্রমণের উপরেই যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হঠাৎ সেইজন্য সকল জাতির দৃষ্টি একযোগে এরোপ্লেন গঠনের দিকে পড়িল। কোন্ দেশের বৈমানিক আকাশ-পথে কত দ্রুত যাইতে পারেন, তাহার তুমুল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া গেল এবং যে যন্ত্র যুদ্ধের প্রেরণায় নির্ম্মিত হইয়াছিল, দেখা গেল শান্তির সময়, তাহাও মানুষের সভ্যতার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় জিনিস।

কয়েক বৎসর আগে মেলবোর্ণের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে জগতের সব চেয়ে বড় এরোপ্লেন প্রতিযোগিতার আয়োজন হইয়াছিল। লণ্ডন হইতে মেলবোর্ণ পর্য্যন্ত যিনি এরোপ্লেনে সকলের চেয়ে শীঘ্র পৌঁছাইয়াছিলেন, তিনি পনেরো

হাজার পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

২

আমরা আজকাল যে-ধরণের এরোপ্লেন বা জেপ্‌লিন দেখি, প্রথম আকাশ-পথে বিহার করিবার জন্য মানুষ তাহাদের সন্ধান পায় নাই। সর্ব্বপ্রথম মানুষ বেলুনে করিয়াই আকাশ-পরিভ্রমণ করিবার চেষ্টা করে। ফরাসী দেশে জোসেফ মন্‌ত্‌-গল্‌ফিয়ে এবং ষ্টিফান মন্‌ত্‌গল্‌ফিয়ে নামে দুই ভাই ছিল। সর্ব্বপ্রথম আকাশে তাঁহারাই উড়াইবার জন্য বেলুন তৈয়ার করেন। ফরাসী দেশেই বেলুনের উৎপত্তি এবং বেলুনের সাহায্যে আকাশ-বিহার করার পন্থা সেই দেশেই মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে আবিষ্কৃত হয়। বেলুন কথাটাও হইল ফরাসী ভাষার কথা। সেই সময় ফরাসী রাসায়নিকগণ ফানুসের মত গঠন এক রকম কাঁচের যন্ত্র ব্যবহার করিতেন—তাহার নাম ছিল বেলুন। ঠিক তাহারই মত গঠন বলিয়া ফানুসেরও নাম হয়, বেলুন।

প্রথম প্রথম পরীক্ষা হইতে লাগিল, শুধু বেলুন কতক্ষণ উপরে থাকিতে পারে? এই সময় একবার একটি বেলুন পুড়িয়া গিয়া এক গ্রামে কৃষকদের ক্ষেতে আসিয়া পড়ে। ক্ষেতের চারিদিকে যে-সব কৃষকেরা কাজ করিতেছিল, তাহারা মনে করিল আকাশ হইতে নিশ্চয়ই কোন ভয়াবহ জন্তু আসিয়া পড়িয়াছে। শাবল, কোদাল, লাঠি যে যাহা পাইল, তাহা

লইয়াই প্রস্তুত হইল। একজন বাড়ী হইতে বন্দুক লইয়া আসিল। সশস্ত্র হইয়া তখন সকলে মিলিয়া একযোগে আকাশ-হইতে-আসা সেই জন্তুটিকে আক্রমণ করিল। যখন দেখিল, জন্তুটি আর্ত্তনাদও করে না, এক ফোঁটা রক্তও পড়ে না, তখন বিস্ময়ে আকাশের দিকে চাহিয়া তাহারা আরও শঙ্কিত হইয়া উঠিল, বুঝি বা ভূত-প্রেত-সংক্রান্ত কোন ব্যাপার হইবে!

এই ঘটনার কথা অবগত হইয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্ট গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে ইহা কোন জন্তু নয় মানুষেরই তৈয়ারী করা এক রকম জিনিষ, ইহার সাহায্যে মানুষ আকাশে উড়িবার চেষ্টা করিতেছে।

এবারে যাঁহারা বেলুন তৈয়ারী করিতেছিলেন, তাঁহাদের সমস্যা হইল, বেলুন তো হইল, বেলুনে করিয়া আকাশে উঠিবে কে?

প্রথমে স্থির হইল যে, কতকগুলি জন্তুকে দিয়া প্রথম পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। ফ্রান্সের রাজা, রাজসভাসদ্ এবং জনসাধারণের সামনে মন্‌ত্‌গল্‌ফিয়েরা বেলুন ছাড়িলেন। বেলুনের সঙ্গে একটা বড় ঝুড়ির মতন জিনিস ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। সেই ঝুড়িতে একটি মোরগ, একটি হাঁস এবং একটি ছাগলকে উঠাইয়া দেওয়া হইল। সেই তিনটি ইতর প্রাণীই হইল জগতের প্রথম বিমান-যাত্রী।

বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে বেলুন আকাশে উঠিল।

কেহ বলিতে লাগিল, একটু উপরে উঠিলেই জন্তুগুলি দম আটকাইয়া মরিয়া যাইবে; কেহ অনুমান করিল, উপরে

নিশ্চয়ই খুব ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডায় হয়ত উহারা মৃতপ্রায় হইয়া যাইবে ; কেহবা অনুমান করিল, নিশ্চয়ই ছিটকাইয়া পড়িয়া যাইবে।

বেলুনটি যখন নির্ব্বিঘ্নে আবার মাটিতে নামিয়া আসিল, তখন দেখা গেল যে, সকলেরই অনুমান ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে ! মুর্গীটি মাটিতে নামিয়াই বিস্ময়ে কয়েকবার ডাকিয়া উঠিল, ছাগলটি তখনও পরমানন্দে ঘাস চিবাইতেছিল এবং হাঁসটি ঘাড় দুলাইয়া ভাবিতেছিল, কোথায় সাঁতারের জল পাওয়া যায় !

এই ঘটনার পর স্থির হইল যে, এইবার বেলুনে কোন মানুষকে যাইতে হইবে। কিন্তু কে যাইবে ? মৃত্যুর মধ্যে কে ঝাঁপাইয়া পড়িবে ? মাটির উপর মানুষ সাহস করিয়া বহু কাজ করিতে পারে। কিন্তু আকাশে সে একেবারে অসহায়। সেখানকার আবহাওয়া, অবস্থা সম্বন্ধে তখনও পর্য্যন্ত মানুষের বিশেষ কোনও অভিজ্ঞতা জন্মায় নাই। অথচ, সমস্যা হইল যে মাটিতে থাকিয়া আকাশের বায়ু-মণ্ডলের অবস্থা বুঝিবার কোন উপায় নাই। বায়ুমণ্ডলের অবস্থা বুঝিতে হইলে, প্রকৃত বায়ুস্তরের মধ্যে বিচরণ করিয়াই সেই জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে। কে প্রথম এই দুরূহ সাধনায় আত্মসমর্পণ করিবে ? অনেক জল্পনা-কল্পনার পর স্থির হইল যে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত দুইজন বন্দীকে পাঠান হউক ! তাহারা তো এমনই মরিত, সুতরাং তাহাদের উপর দিয়াই পরীক্ষা করা যাক্ !

কিন্তু এক শ্রেণীর লোক এই প্রস্তাব শুনিয়া ক্ষুণ্ণ এবং

বিরক্ত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, মানুষের অগ্রগতির এত বড় একটা আবিষ্কারের প্রথম পরীক্ষার সঙ্গে দুইজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কলঙ্কিত লোকের নাম ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে, আর আমরা ভীত শঙ্কিত হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিব, তাহা কখনই হইতে পারে না! যে-মানুষ আকাশ-জয় করিতে বাহির হইয়াছে, তাহার পক্ষে মৃত্যুভয় সাজে না!

দ্য রোজিয়ার নামে একজন দুঃসাহসী ফরাসী ঘোষণা করিলেন যে, বেলুনে উঠিয়া তিনিই প্রথম আকাশ-পরিভ্রমণে যাইবেন। তাঁহার বন্ধু মার্কুইস্ দ্য আর্লান্দো তাঁহার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইলেন। রোজিয়ার নিজে একটি বেলুন তৈয়ার করিলেন এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁহারা দুইজনে সেই বেলুনে করিয়া আকাশে উঠিলেন।

আধ-ঘণ্টার পর তাঁহাদের বেলুন মাটিতে নামিয়া আসিল এবং সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নে তাঁহারা দুইজনে আবার মাটিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই ঘটনার পর হইতে বেলুনে আকাশ-বিহার করিতে মানুষের ভয় কাটিয়া গেল।

রোজিয়ার ঠিক করিলেন যে, বেলুনে চড়িয়া তিনি ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে যাইবেন। ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের মাঝখানে ইংলিশ চ্যানেলের জলরাশি। রোজিয়ারের এই সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া এই দুঃসাহসী লোকটির ভাগ্য পরিকল্পনা করিয়া লোকে শিহরিয়া উঠিল।

তখন হাইড্রোজেন গ্যাস সবেমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। খুব হাল্‌কা বলিয়া এই গ্যাস বেলুনে পুরিয়া তিনি যাত্রা

করিলেন। কিন্তু এই গ্যাসের অপরাপর প্রকৃতি সম্বন্ধে তখনও সব-কিছু জানা যায় নাই।

রোজিয়ারের বেলুন বায়ুভরে ফ্রান্সের উপকূল ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের দিকে চলিল। ফলাফল জানিবার জন্য ইংলিশ চ্যানেলের দুইপারে শত সহস্র লোক উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করিতে লাগিল।

২

রোজিয়ারের বেলুন বায়ুভরে ঊর্দ্ধ আকাশে উঠিল। কিছুক্ষণ পরে সহসা আকাশে এক ভীষণ শব্দ হইল। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, রোজিয়ারের বেলুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

অনুসন্ধানের পর যখন রোজিয়ারের দেহ খুঁজিয়া পাওয়া গেল, তখন কঠিন মাটির স্পর্শে তাহা থ্যাৎলাইয়া জড়পিণ্ডের মত হইয়া গিয়াছে। আকাশকে জয় করিবার সাধনায় রোজিয়ার হইলেন প্রথম বলি।

কিন্তু এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর যে মানুষ ভীত হইয়া আকাশে উড়িবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিল, তাহা নহে—সে আরও বিপুল উদ্যমে আকাশ জয় করিবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিল। শুধু আত্মনিয়োগ নয়, বহু লোককে আত্মদান করিতে হইয়াছে। আকাশে যে-পথ দিয়া এরোপ্লেন বা উড়োজাহাজ দ্রুত চলিয়া যায়, সেই পথের চারিদিকে শূন্যমণ্ডলে বহু দুঃসাহসী আকাশ-পথের পথিকের শেষ-আর্ত্তনাদ মিশান আছে।

৪

অনেকের ধারণা যে, এরোপ্লেন এবং উড়োজাহাজ যাহাকে ইংরাজীতে এয়ার-সিপ বা জেপ্‌লিন বলে, তাহা বুঝি একই জিনিস্‌। এরোপ্লেন এবং উড়োজাহাজ বা জেপ্‌লিন দুইটি স্বতন্ত্র ধরণের যান। অবশ্য দুইটিই যদিও আকাশ-যান, তাহা হইলেও তাদের গঠন, যন্ত্রপাতি, নির্ম্মাণ-বিজ্ঞান, এবং ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের।

উড়োজাহাজের গঠন, বাহির হইতে দেখিতে ঠিক একটি বড় বর্ম্মা চুরোটের মত। ডুরেলিনিয়াম্‌ নামক একপ্রকার ধাতুর দ্বারা ইহার খোল তৈয়ারী হয়। এই খোল বা আবরণের ভিতর মানুষের বসিবার জায়গা থাকে। গোড়ায় বেলুন লইয়া যে-সব পরীক্ষার কথা আলোচনা করিতেছিলাম, তাহারই পরিণতি উড়োজাহাজ বা জেপ্‌লিনে, উড়োজাহাজের আর এক নাম জেপ্‌লিন। কারণ জার্ম্মানীর কাউণ্ট জেপ্‌লিন-ই সর্ব্বপ্রথম এই ধরণের উড়োজাহাজ নির্ম্মাণকার্য্যে সাফল্য লাভ করেন। তাঁহারই নাম অনুসারে এই সব উড়োজাহাজের নাম হয় জেপ্‌লিন। কাউণ্ট জেপ্‌লিন অসাধারণ প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে সামরিক-বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করার পর, তিনি নূতন করিয়া বিজ্ঞান পড়িয়া বর্ত্তমান জগতের এই অন্যতম বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। মহাযুদ্ধের সময় তাঁহার নির্ম্মিত জেপ্‌লিন লণ্ডন শহর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল এবং আকাশ-পথ হইতে অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কায় সেদিন লণ্ডন শহরের অধিবাসীরা রাত্রিবেলায় কেহ ঘরে আলো জ্বালিত না। প্রথম

মহাযুদ্ধের সময়ই প্রকৃতপক্ষে এরোপ্লেনের এবং উড়োজাহাজের দ্রুত উন্নতি হয়।

বায়ুতে বা গ্যাসে না ভরিলে যেমন বেলুন বাতাসে ভাসিয়া থাকিতে পারে না, তেমনি গ্যাস না ভরিলে উড়োজাহাজ বাতাসে ভাসিতে পারে না। খোলের ভিতরে গ্যাস ভরিবার জন্য প্রকোষ্ঠ থাকে। সেই সব প্রকোষ্ঠে গ্যাস ভরা থাকে—সেইজন্য উড়োজাহাজ বাতাসে ভাসিয়া থাকিতে পারে এবং সেইজন্য উহা বায়ুর অপেক্ষা হাল্কা। ইংরাজীতে সেইজন্য উড়োজাহাজকে বায়ুর অপেক্ষা হাল্কা আকাশ-যান (lighter than air) বলা হয়। এরোপ্লেন গঠন-রীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। পাখীর ডানার মত তাহার দুইদিকে দুইটি ডানা থাকে—এই ডানাগুলিরই নাম—প্লেন। এরোপ্লেন বায়ুর চেয়ে ভারী আকাশ-যান। তাহাতে কোনও গ্যাসের প্রয়োজন হয় না। সে আপনা হইতে সেইজন্য আকাশে ভাসিয়া থাকিতে পারে না। এক মুহূর্ত্তের জন্যও আকাশে সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না—তাহার এঞ্জিন অনবরত তাহাকে চালাইয়া লইয়া চলিয়াছে। এরোপ্লেনের একটা প্রধান সুবিধা হইল যে উড়োজাহাজের চেয়ে তাহা ঢের দ্রুত চলাফেরা করিতে পারে; কিন্তু উড়োজাহাজের সুবিধা হইল, তাহাতে এরোপ্লেন অপেক্ষা ঢের বেশী যাত্রী এবং জিনিস ধরে।

পাখীদের উড়িবার কায়দা লক্ষ্য করিয়াই মানুষ এরোপ্লেন তৈয়ার করিবার প্রেরণা লাভ করে। জার্ম্মাণীতে লিলিয়ান্থেল নামক একজন যুবক নিজের দেহের সঙ্গে পাখীর ডানার মত ডানা সংযুক্ত করিয়া, ছোট ছোট পাহাড় হইতে লাফ দিয়া, সেই

ডানায় ভর করিয়া মাটিতে নামিতে চেষ্টা করিতেন। দু'হাজার বার তিনি এইরকম ভাবে নানা পরীক্ষা করেন। অবশেষে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মোটর-এঞ্জিন-সংযুক্ত পাখাওয়ালা আকাশ-যান অর্থাৎ এরোপ্লেন তৈয়ার করিয়া আকাশে উড়িবার চেষ্টা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কল খারাপ হইয়া যাওয়ায় এরোপ্লেন-শুদ্ধ তিনি পড়িয়া যান এবং সেই অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। লিলিয়া-ন্থেলের প্রচেষ্টার কথা শুনিয়া গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ পিল্‌চারও লিলিয়ান্থেলের পন্থা অনুসরণ করিয়া একটি এরোপ্লেন তৈয়ার করেন। কিন্তু তিনিও সকল দিক হইতে লিলিয়ান্থেলকে অনুসরণ করিলেন; পরীক্ষা দিবার দিনই, আকাশ হইতে পড়িয়া তিনিও অকালমৃত্যুকে বরণ করিলেন।

এই সমস্ত ব্যর্থ উদ্যমকে সফল করিয়া তুলিলেন আমেরিকার দুইজন যুবক—দুই ভাই। তাঁহাদের নাম উইলবার রাইট্, এবং অলিভার রাইট্; কাউণ্ট জেপ্‌লিন যেমন উড়োজাহাজের সৃষ্টি-কর্ত্তা, রাইট্ ভ্রাতৃদ্বয় সেই রকম বর্ত্তমান এরোপ্লেনের সৃষ্টিকর্ত্তা। দুই ভাইয়ের ছিল সাইকেলের কারখানা। সেই সাইকেলের কার-খানায় গোপনে এরোপ্লেন তৈয়ারী করিবার জন্য নানা রকমের পরীক্ষা চলিতে লাগিল। দুইজন সামান্য সাইকেল-মেরামত-কারীকে অর্থ দিয়া কে সাহায্য করিবে? অথচ অর্থ না হইলে, পরীক্ষা সম্ভব নয়। দুই ভাইয়ের এক বোন ছিল। তাঁহার নাম ছিল ক্যাথেরিন। তিনি স্কুল-মাষ্টারী করিতেন। ভাইদের উৎসাহ দেখিয়া ক্যাথেরিন তাঁহার উপার্জ্জনের সমস্ত টাকা তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দিলেন।

এই ভাবে ভগ্নীর অর্থসাহায্যে রাইট্ ভ্রাতৃদ্বয় বহুদিন বহু পরীক্ষার পর একটি এরোপ্লেন গড়িয়া তুলিলেন। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁহারা ফ্রান্সে গিয়া সেই এরোপ্লেনের পরীক্ষা দিলেন! সমবেত জনতার সামনে ছ'ঘণ্টা কুড়ি মিনিটে সাতাত্তর মাইল আকাশ-পথ পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে মাটিতে অবতরণ করিলেন। সেইদিন হইতে প্রকৃতপক্ষে জগতে এরোপ্লেনের আবির্ভাব হইল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইহার গঠন, কল-কৌশল ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

সমস্ত জগতে যখন রাইট্ ভ্রাতৃদ্বয়ের এরোপ্লেনে আকাশ-বিহারের কথা ছড়াইয়া পড়িল, তখন প্রত্যেক দেশই চেষ্টা করিতে লাগিল, কি করিয়া অন্যদেশের অপেক্ষা দ্রুতগামী এরোপ্লেন তৈয়ারী করা যায়। এই ব্যাপার লইয়া দেখিতে দেখিতে, ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বৈমানিকদের মধ্যে এক তুমুল প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া গেল। প্রত্যেক দেশের বিশিষ্ট ধনীরা প্রতিযোগিতার জন্য বড় বড় পুরস্কার ঘোষণা করিতে লাগিলেন। মেলবোর্ণ শতবার্ষিকী উৎসবে লণ্ডন হইতে মেলবোর্ণ পর্য্যন্ত এরোপ্লেন-প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। এত বড় এরোপ্লেন-প্রতিযোগিতা ইদানীং আর হয় নাই। এই সব প্রতিযোগিতার ফলেই, এরোপ্লেন দেখিতে দেখিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আকাশ-পথ অধিকার করিয়া ফেলিল। আজ এই এরোপ্লেন জগতের যুদ্ধ-রীতি পর্য্যন্ত বদলাইয়া দিয়াছে। কারণ, আজকের যুদ্ধ এরোপ্লেনের যুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাহা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।



বোলোনা শহরের বাইরে পাহাড়ে-পথে একটি পাঁচবছরের ছেলে আপনার মনে ঘুরে বেড়াত, বুনো ফল সংগ্রহ করে।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে ছেলেটি দেখে দিব্যি কালো জামের মত এক রকম ফল গাছে ধরে রয়েছে—ছুটি আঙুলের মাঝখানে টিপতেই খানিকটা বেগুনী রঙের রস ছিটকে এসে বালকের পোষাকটি চিত্রিত করে দিল। সেই পাঁচ বছরের ছেলের তক্ষুনি মনে হলো যে, এ থেকে তো বেশ ভাল কালি হতে পারে! চমৎকার বেগুনী রঙের কালি!

চেষ্টা-চরিত্র করে বালক তখনই একটা বোতল সংগ্রহ করে ফেল্ল। সেই বনেতে বসেই ফল নিংড়ে প্রায় আধ বোতল

তৈরী হল। প্রাণের উল্লাসে বোতলটি নিয়ে বালক ছুটে তার মাকে দেখাতে গেল, কি মজা! সেই রঙের বোতলটি দেখবার আগেই তাঁর মা দেখেন যে, ছেলের পোষাক রঙে আর কাদায় চিত্র-বিচিত্র হয়ে গিয়েছে! পুত্রের আবিষ্কারের দিকে কোন দৃক্‌পাত না করেই, জগতের বহু-অনুষ্ঠিত অবিচারের পুনরাবৃত্তি-স্বরূপ তিনি সেই শিশু-আবিষ্কারককে তাঁর আবিষ্কারের পুরস্কার স্বরূপ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করলেন।

সেই হলো মার্কনীর অসাধারণ আবিষ্কার-প্রতিভার প্রথম প্রকাশ এবং প্রথম অভিনন্দন।

মার্কনার বাবা ছিলেন ইতালীয়ান্ কিন্তু তাঁর মা ছিলেন বৃটিশ-রমণী। তাই তিনি এই দুই দেশকে তাঁর স্বদেশ মনে করতেন। দুটি ভাষাতেই তাঁর ছিল সমান অধিকার।

আপেনাইন্ পর্ব্বত-মালার ছায়ায় সুপ্রাচীন বোলোনা শহরে —যে বোলোনা শহরের সঙ্গে ইতালীর অতীত গৌরবের বহু স্বর্ণযুগ অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত—সেখানে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল ভিলা গ্রিফনে মার্কনী জন্মগ্রহণ করেন।

মার্কনীর শৈশব সম্বন্ধে সকল খবর এখনও পর্য্যন্ত আমরা জ্ঞাত নই, তবে তাঁর শৈশব-বেলার খেলাধূলা এবং আচরণ থেকে আজ স্পষ্ট বোঝা যায় যে ভগবান তাঁকে আবিষ্কর্ত্তার সমস্ত ঐশ্বর্য্য দিয়েই পাঠিয়েছিলেন। বোলোনা শহর থেকে প্রায় শতেক মাইল দূরে হলো লেগ্‌হর্ণ বন্দর। এই বন্দর স্কুল-কলেজ এবং পড়াশোনার সুবিধার জন্যে বহুদিন থেকে খ্যাত। বালক মার্কনীকে এই লেগ্‌হর্ণের স্কুলে অধ্যাপক

রোসার তত্ত্বাবধানে পাঠান হলো। সেখানেও বালকের চরিত্রের সেই বিশেষত্ব স্পষ্ট দেখা যায়। ক্লাসের পড়াশোনার দিকে বালকের নজর ততখানি ছিল না, যতখানি ছিল আগ্রহ স্কুলটির ল্যাবরেটরীর যন্ত্র-পাতি নাড়াচাড়া করা সম্বন্ধে।

মার্কনী যখন বালক, সেই লেগ্‌হর্ণ স্কুলের ছাত্র, সেই সময় আমেরিকায় এক বৈজ্ঞানিক যাদুকর বিদ্যুৎকে নিয়ে জগতে নিত্য নব অঘটন ঘটাচ্ছিলেন। তিনি হলেন বিজ্ঞানের যাদুকর টমাস্ আল্‌ভা এডিসন। এডিসনের সৃজন-প্রতিভার নিত্য নতুন কীর্ত্তিতে য়ুরোপ তখন প্রশংসায় মুখরিত। অনেকে মনে করেন যে বালক মার্কনীর মনকে বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানের দিকে আকর্ষণ করে এডিসনের এই সব কীর্ত্তিকথা! এডিসন তখন য়ুরোপের প্রত্যেক তরুণের কাছে এক নতুন জগতের নতুন বীরপুরুষ।

লেগ্‌হর্ণের স্কুল ছেড়ে মার্কনী এলেন বোলোনার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। বালক-কালের বিজ্ঞান-কৌতূহল তখন তীব্র জ্ঞান-পিপাসায় পরিণত হয়েছে। এই বোলোনার বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তিনি অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গের রহস্য-কথার প্রথম পরিচয় পেলেন। হার্ৎজের উদ্ভাবিত ইথার-তরঙ্গ সম্বন্ধে তখন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অধ্যাপক, রিথি এবং অরেষ্টা, গবেষণা করছিলেন। তাঁদের দু'জনের কাছ থেকে মার্কনী সেই নব-জাত বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করলেন এবং সেই পাঠ-অবস্থায় তাঁর মনে তিনটি প্রশ্ন জাগে।

প্রথম, এমন কোন যন্ত্র বার করা যায় না যার দ্বারা এই হার্ৎজ-পরিকল্পিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গে গতি সঞ্চার করা যায়?

দ্বিতীয়, কি উপায়ে সেই সব তরঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে ?

এবং তৃতীয় হলো, এমন যন্ত্রের সৃষ্টি সম্ভব কি না, যার দ্বারা এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দূর থেকে ধরা যেতে পারে ?

বোলোনার বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি ছাত্র, সেই সময়ই তিনি তাঁর বাপের জমিদারীতে এক বাগানে ছুটির সময় আপনার মনে এই নিয়ে পরীক্ষা সুরু করলেন। হার্ৎজের পদ্ধতি অনুসরণ করে, তিনি তাঁর জীবনের ট্রান্স-মিটার সেই বাগানে পত্তন করলেন। তারপর চলতে লাগলো দিনের পর দিন মাসের পর মাস পরীক্ষা।

তখন জগতে চারিদিকে চলছিল এই নিয়ে পরীক্ষা। মার্কনীর মন সেই সব নব নব তথ্য এবং আবিষ্কারের সন্ধানে সর্ব্বদাই ছিল সজাগ হয়ে। এর পর থেকে তাঁর জীবন বেতার-টেলিগ্রাফীর জন্ম-ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত। এবং সে কাহিনী এই গ্রন্থের অন্যত্র সন্নিবেশিত আছে—এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। ব্রাণলী, স্যার অলিভার লজ, পোপফ, একের পর এক এই নব বিজ্ঞানের এক একটি উপাদান সরবরাহ করেছেন—তারই সাহায্যে যাদুকরের সৃজন-প্রতিভা নিয়ে মার্কনী প্রথম সফল বেতার-যন্ত্র তৈরী করলেন। যেদিন তিনি পরীক্ষা করে নিজে বুঝলেন যে বিনা-তারে শব্দ প্রেরণ করা সম্ভব, তিনি স্থির করলেন যে তিনি ইংলণ্ডে আসবেন। যেদিন তিনি সেই সঙ্কল্প নিয়ে ইংলণ্ডে এসেছিলেন, সেদিন তাঁর বয়স ছিল মাত্র একুশ। সেই একুশ বছর বয়সেই তিনি দিগ্বিজয়ে বেরুলেন।

ইতালীর রাজ-সরকারের কাছ থেকে পরিচয়-পত্র নিয়ে মার্কনী ১৮৯৬ সালের মে মাসে ইংলণ্ডে এলেন এবং ইংলণ্ডে নেমেই তিনি সেই সময়কার ইংলণ্ডের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইলেকট্রিসিয়ান প্রীসের সঙ্গে দেখা করলেন। স্যার উইলিয়াম প্রীস সেই তরুণ যুবকের দুরাকাঙ্ক্ষার কথা শুনলেন এবং মার্কনীর সৌভাগ্য যে বন্ধুহীন বিদেশে এসে তিনি তাঁর দুরূহ সাধনার পথে একজন সত্যিকারের বন্ধু পেলেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন। Isle of Wight-এ মার্কনী একটি ছোট বেতার ষ্টেশন করেছেন। সেই বেতার ষ্টেশন থেকে ১৮ মাইল দূর পর্য্যন্ত সংবাদ গ্রহণ ও প্রেরণ তখন সম্ভব হয়েছে।

সমস্ত শিক্ষিত-মহলের কৌতূহল-দৃষ্টি তখন সেই ছোট্ট বেতার ষ্টেশনটির ওপর। যেদিনের কথা উল্লেখ করলাম, সেদিন সেই বেতার ষ্টেশনে দু'জন লোক এসেছেন—একজন হলেন ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন এবং আর একজন হলেন ইংলণ্ডের কবি লর্ড টেনিসন্। তাঁরা দেখতে এসেছেন। মার্কনী তাঁদের দুজনকে নিয়ে সমস্ত যন্ত্রপাতি দেখালেন, ব্যাপারটা বোঝালেন। তখন লর্ড কেলভিন বল্লেন, আচ্ছা আমি যদি এখন আমার কোন বন্ধুকে সংবাদ পাঠাতে চাই, তা কি সম্ভব হবে?

—নিশ্চয়ই!

লর্ড কেলভিন্ তাঁর এক বন্ধুর কাছে যা টেলিগ্রাম করতে হবে লিখে দিলেন। তারপর মার্কনীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্লেন, দেখুন, আমি এর জন্যে একটা যা হোক মূল্য দিতে চাই! প্রত্যেক খবরের জন্যে আমি একটা করে শিলিং দিচ্ছি—আপনার

খরচ দেখে নয়, ইংলণ্ডের লোককে জানাবার জন্যে যে এ-থেকে একটা বড় ব্যবসায়ের সম্ভাবনা আছে।

মার্কনী লর্ড কেলভিনের শিলিং গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই হলো জগতের প্রথম "paid wireless message".

তাঁর প্রথম বেতার পরীক্ষা সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখেছেন,—"বেতারের প্রথম পরীক্ষা থেকেই আমার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে বেতারের সাহায্যে একদিন পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সংবাদ প্রেরণ করা সম্ভবপর হবেই। আটলান্টিক মহা-সমুদ্রের অপর কূলে এ-সংবাদ পাঠানো সম্ভবপর কিনা তাই নিয়ে পরীক্ষা সুরু করলুম।

স্বভাবতঃই আমার মনে হ'ল যে আটলান্টিক সমুদ্রের ওপার থেকে যদি খুব শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রেরণ করা যায়, তাহ'লে সেই তরঙ্গ এপারের গ্রাহক যন্ত্রে এসে ধাক্কা দিতে পারে। তাই পরীক্ষা করার জন্য নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে আমি যাত্রা করলুম। কিন্তু গ্রাহক যন্ত্রে লাগানোর জন্য যে প্রকাণ্ড এরিয়েল করার প্রয়োজন তা' করবার সময় তখন আমার ছিল না। অতএব এরিয়েল খাটাবার জন্য প্রকাণ্ড একটা ঘুড়ি বা বেলুনের সাহায্য গ্রহণ করলুম। বেলুনের তলায় তার বেঁধে আকাশে ছেড়ে দিলুম, প্রকাণ্ড এরিয়েল তৈরী হল।

আমার সহকারীকে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কর্ণওয়াল থেকে বেতার সঙ্কেত পাঠাতে বলেছিলুম। সঙ্কেতটি ছিল "এস" (S)। এই শব্দটা সুবিধেজনক বলেই ব্যবহার করেছিলুম। পূর্ব্বেই বলেছি যে ৪০০ ফিট লম্বা তারলু বেনের সাহায্যে আমাকে



ঝুলিয়ে রাখতে হয়েছিল; সেইটেই ছিল আমার এরিয়েল, সেই এরিয়েলে শব্দতরঙ্গ ধরার সুবিধে ছিল।

১২ই ডিসেম্বর একটি মোর্স যন্ত্র নিয়ে—ও কানে ফোন লাগিয়ে আমি সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। মোর্স যন্ত্র টেলিগ্রাফ বিভাগে ব্যবহৃত হয়। সেই যন্ত্রে তিনটি বিন্দু রেকর্ড হ'ল এবং আমিও স্বকর্ণে টিক্, টিক্, টিক্, ক'রে তিনটি ধ্বনি শুনতে পেলুম। এই ভাবে তিনবার সঙ্কেত এল। তৎক্ষণাৎ আমার বিশ্বাস হল যে যে-কোন উপায়ে আমি দূরকে নিকট করে তুলতে পারবো। মানুষের সঙ্গে মানুষের, এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের, পৃথিবীর এক প্রান্তের সঙ্গে আর এক প্রান্তের সংযোগ এত দ্রুত হবে যা এতদিন স্বপ্ন ছাড়া বাস্তব বলে কেউই মনে করতে পারেনি। তার পরের দিনও ঠিক ঐভাবে পরীক্ষা চালালুম, তবে শব্দটা অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এল।

যাই হক, সেদিনকার বিশ্বাস আমার মনের মধ্যে এক নূতন কর্ম্মপ্রেরণা জাগালো। তারপর থেকে সকল দিক দিয়ে আমি বেতারকে সার্থক করে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কোন কারণে যদি প্রথম পরীক্ষায় সাফল্য লাভ না করতুম, তা'হলে আমি কতদূর এগিয়ে আসতে পারতুম জানিনা, তবে ব্যর্থকাম হয়ে চঞ্চল হয়ে পড়া আমার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। আমার মনে হয় পৃথিবীতে যদি কেউ সত্যিকারের সার্থকতা লাভ করতে চান, তাহলে হতাশাকে কোন দিনই কেউ যেন না প্রশ্রয় দেন।"

বেতারের ক্রমবিকাশ কিন্তু কোন একজন বৈজ্ঞানিকের দ্বারা

সম্ভব হয়নি। মার্কনীর নিজের কথায় বেতারের জন্ম-ইতিহাসের কথা বলতে গেলে বলতে হয়,—

“প্রায় একশো বছর আগে, যেদিন মাইকেল ফ্যারাডে আবিষ্কার করলেন যে বিদ্যুৎ-আবিষ্ট গালা যে কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করে, তার হেতু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে এই আকর্ষণী শক্তি গালা এবং কাগজে আছে, তা নয়,—সেই দুটো জিনিষের মাঝখানে যে শূন্য স্থান আছে, সেই শূন্য স্থানেই এই টানাটানি ঘটছে,—সেদিন বলা যেতে পারে যে বেতার-বিজ্ঞানের প্রথম বীজ উপ্ত হলো। তারপর ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল তাঁর যুগান্তকারী এলেক্‌ট্রো-ম্যাগনেটিক সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করলেন। এই সিদ্ধান্তে গণিতশাস্ত্রের সহায়ে তিনি দেখালেন যে, ইথারেও বৈদ্যুতিক টানাটানির ফলে তরঙ্গ উঠবে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে হাৎর্জ তা প্রমাণ করে দেখালেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আমি সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষা করি যে কি ভাবে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে দূরে সংবাদ টেলিগ্রাফ করা যায়। এবং ইহার কিছুদিন পরে সামান্য দূরবর্ত্তী স্থানের মধ্যে এই উপায়ে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণে সমর্থ হই।

বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে বা তারের সাহায্যে টেলিফোনী বলতে আজ আমরা যা বুঝি, তার সূত্রপাত হয় কার্ব্বন রিসিভার এবং এলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক রিসিভারের সৃজনের সঙ্গে সঙ্গে। এই ব্যাপার ঘটে হাৎর্জের প্রমাণের আগে, ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌-ওয়েলের সময়। তার কারণ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ফ্রেডারিচ্‌ডর্ফের Phillip Reis একটা সেকেলে ধরণের যন্ত্র তৈরী

করেন, যার সাহায্যে কিছুদূরে সংবাদ-প্রেরণ করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৭১-এ Antonio Meucci এবং ১৮৭৪-এ Elisha Gray স্বতন্ত্রভাবে ছুটি যন্ত্রের পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। এই ছুটি যন্ত্রের সাহায্যেই শব্দ প্রেরণ করা যেতো, কিন্তু শব্দ খুব স্পষ্ট হতো না। তারপর এলেন ডাঃ গ্রাহাম বেল। তিনিই ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম কার্য্যকরী টেলিফোন যন্ত্র তৈরী করলেন।

এই ঘটনার ছু'বছর পরে কার্ব্বন মাইক্রোফোনের সৃষ্টি হয়। এই আবিষ্কারের জন্য আমরা Professor Hughes, Edison এবং Rev. Hunnings-এর নিকট ঋণী। তাঁরা তিন জনেই তাঁদের স্বতন্ত্র যন্ত্রের জন্যে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। তারপর থেকে স্থলপথে টেলিফোনের বিজয়যাত্রা স্বুরু হয়ে গেল এবং ক্রমশঃ সমুদ্রের তলায় তারের সাহায্যে সমুদ্রের ব্যবধানও ঘুচে গেল। কিন্তু কিছুকালের মত এদিকে আর বেশী কিছু উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিল না।

তারপর ১৯০০ সালে সর্ব্বপ্রথম Professor R. A. Fessenden বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে শূন্য দিয়ে শব্দ প্রেরণ করবার চেষ্টা করেন। বহু চেষ্টার পর তিনি এক মাইল দূর পর্য্যন্ত শব্দ পাঠাতে কৃতকার্য্য হন। আমি তখন চেষ্টা করছিলাম কি করে ৩৬ মাইল দূরে শব্দ প্রেরণ করা যায়।

১৯০২ সালে E. Ruhmer কুড়ি মাইল দূরে শব্দ প্রেরণ করলেন। তারপর ১৯০৬ সালে Professor Fessenden সর্ব্বপ্রথম হাই ফ্রিকোয়েনসি অল্‌টারনেটর) high frequency

alternator) ব্যবহার করে সেকেণ্ডে ২০০০০ সাইকেল্ ক্যারিয়ার (carrier) তরঙ্গের উৎপাদন করলেন। তার ফলে তিনি Brant Rock১ থেকে Long Island-এ দুশো মাইল দূরে শব্দ প্রেরণ করতে কৃতকার্য্য হলেন।

তখন ওয়ারলেস টেলিগ্রাফীর অবস্থা কি দেখা যাক। ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্ব্বপ্রথম আমি আটলান্টিক মহাসাগরের এ-পারে Poldhu থেকে ১৮০০ মাইল দূরে নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ডের সেণ্টজন বন্দরে বেতারে টেলিগ্রাফ সিগ্ন্যাল প্রেরণ এবং গ্রহণে কৃতকার্য্য হই। এই পরীক্ষার পর আমার স্থির বিশ্বাস হলো যে যতদূরে হোক বেতারে সংবাদ প্রেরণ এবং গ্রহণ করা সম্ভব। ১৯০২ সালে আমি "ফিলাডেলফিয়া" নামে এক আমেরিকান্ জাহাজে নিউইয়র্কে আসছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল পল্‌ধু থেকে সারা পথ কিভাবে বেতারে সংবাদ ধরা পড়ে, তার ফলাফল পর্য্যবেক্ষণ করা। সারাপথ ধরে রাত্রিবেলা আমি পল্‌ধু থেকে ওয়ারলেস-সিগন্যাল ঠিক পেতাম কিন্তু ৭০০ মাইলের ওধারে দিনের বেলায় সে সিগন্যাল আর ধরতে পারতাম না। অবশ্য এর কারণ এখন জানা গিয়েছে। যে সব সিগন্যাল মাত্র কয়েকশো মিটারের ওয়েভ-লেংথে ছাড়া হয়, দিনের বেলার চেয়ে রাত্রিবেলা তাদের অনেক দূর থেকে ধরা যায়।

তার পরের বছর আমি পল্‌ধু থেকে লুসানিয়া জাহাজে আবার আমেরিকায় যাত্রা করলাম। সারাপথ প্রতিদিন সঠিকভাবে পল্‌ধু থেকে খবরাখবর আমি বেতার-গ্রাহক যন্ত্রে ধরতে

পারলাম। আমার এই সফলতার ফলে দেখতে দেখতে অন্য অনেকগুলি জাহাজে সেই সময় বেতার-গ্রাহক যন্ত্র বসানো হলো এবং ১৯০৪ সালে সমুদ্রগামী জাহাজে বেতারে সংবাদ প্রেরণ করবার জন্যে Wireless Broadcast News Message নামে একটি প্রতিষ্ঠান হলো। যুদ্ধের সময় পল্‌ধু থেকে শুধু সরকারী সংবাদাদি প্রেরণ করা হত এবং তখন পল্‌ধুর ষ্টেশন সরকারী কাজেই ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধের পর পল্‌ধু থেকে আবার প্রয়োজনীয় সংবাদাদি প্রেরণের ব্যবস্থা করা হলো। ১৯২২ সালের মে মাস পর্য্যন্ত পল্‌ধু ষ্টেশন থেকে এইভাবে বেতার-টেলিগ্রাফীর সাহায্যে সমুদ্রগামী জাহাজে, বন্দরে বন্দরে, আবশ্যকীয় সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা চলতে থাকে। তারপর এই ব্যবস্থা পল্‌ধু থেকে ক্লিথডেনে যায়, ক্লিথডেন থেকে কারনাভনে যায়, তারপর লিফিল্ড, এখন রাগবী থেকে এই জাতীয় সংবাদাদি প্রেরণ করা হয়। ১৯০৬ সালে আমার কোম্পানী বৃটিশ পোষ্ট-অফিসে দরখাস্ত করে যে, খবরের কাগজে বেতার-টেলিগ্রাফীর দ্বারা সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থায় যেন উক্ত কোম্পানীকে অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু তখন সে অধিকার দেওয়া হয় নি।

এখন বেতার-টেলিফোনীতে ফিরে আসা যাক। Fessenden যখন ১৯০৬ সালে এই ব্যাপার নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন, তখন আমি ক্লিথডেন, গ্লেস বে, নোভা স্কোসিয়া প্রভৃতি জায়গায় আমার ষ্টেশনগুলির উন্নতি সাধনে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম। তবে সেই সময় আমার একজন সহকর্ম্মী, তাঁর নাম হলো Captain

H. J. Round, আমার এ্যাসিষ্টেণ্ট হিসাবে তিনি আমার কাছে কাজ করতেন, তিনি ইয়র্কে সেই সময় একটা ছোট আর্ক ট্রান্স্মিটারের সাহায্যে নিউ ইয়র্কের "টাইম্স্ বিল্ডিং"এ এবং বন্দরের কোন কোন জাহাজে গ্রামোফোন রেকর্ড এবং ছোট ছোট আলোচনা ব্রডকাষ্ট করতে আরম্ভ করেছেন। অবশ্য তখন ভাল্ভ্ এ্যাম্প্লিফায়ারের উদ্ভব হয় নি; ১৯০৪ সালে ফ্লেমিং ভাল্ভ্ এবং ১৯০৭ সালে Lee de Forest- এর থ্রি-এলেক্‌ট্রোড্ ভাল্ভের উদ্ভবের পর থেকে বেতার-টেলিফোনী দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলো।

১৯১৩ সালের জুন মাসে Dr. Meissner সর্ব্বপ্রথম ক্যারিয়ার তরঙ্গ উদ্ভবের জন্যে অসিলেটিং ভাল্ভের ব্যবস্থা করে বার্লিন থেকে Nanen পর্য্যন্ত (২৩ মাইল) কথা পাঠালেন।

তার পরের বছরই ভাল্ভ্ জেনারেটর নিয়ে আমি পরীক্ষা আরম্ভ করি। ১৯১৪ সালের মার্চ্চ মাসে সিসিলীর কাছে অগাষ্টা বন্দরে একটা যুদ্ধের জাহাজে যন্ত্রটি বসানো হলো এবং আর একটি দ্বিতীয় জাহাজে শব্দ গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করা হলো। এইভাবে সজ্জিত করে সিসিলীর উপকূল ত্যাগ করে দুটি জাহাজকে সমুদ্রের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো। ৭০ কিলো-মিটার দূর থেকে খুব ভাল রিসেপসন পাওয়া গেল। ১২ ঘণ্টা ধরে পরীক্ষার ফলে চমৎকার সুফল পাওয়া গেল।

যুদ্ধের সময় ব্যবসায়-গত দিক থেকে ওয়ারলেস্ টেলিফোনী কিছুকালের মত বন্ধ হয়ে যায়; শুধু সামরিক কাজের জন্যে তা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই নিয়ে পরীক্ষা

চলতে থাকে। ১৯১৫ সালের শেষ দিকে আমেরিকান্ টেলিফোন এণ্ড টেলিগ্রাফ কোম্পানী এবং ওয়েষ্টার্ণ এলেক্‌ট্রিক কোম্পানী একত্রে সম্মিলিত হয়ে আর্লিংটন থেকে প্যারিসের এফেল টাওয়ার ষ্টেশনে একটা পূরো বক্তৃতা ব্রডকাষ্ট করে পাঠালেন। আর্লিংটন ষ্টেশন থেকে এফেল টাওয়ার ষ্টেশন হলো ৩৮০০ মাইল তফাতে।

যুদ্ধ-বিরতির পর য়ুরোপে আবার পূরো উদ্যমে ওয়ারলেস্ টেলিফোনী দিয়ে পরীক্ষা চলতে লাগলো। আয়ারল্যাণ্ডে Ballybunion -এ আমি একটা বেতার ষ্টেশন তৈরী করে, সেখান থেকে কানাডার Louisburg শহরের সঙ্গে দশদিন ধরে কথাবার্ত্তার যোগ সাধন করলাম। আমি যে ভাল্‌ভ্‌ ট্রান্‌স্‌-মিটার ব্যবহার করেছিলাম, জেনারেটর থেকে তা মাত্র ·৫ কিলোওয়াট শক্তি পেতো এবং তার ওয়েভ-লেংথ ছিল ৩৮০০ মিটার।

বেতারের ইতিহাসে ১৯২০ সাল হলো বিশেষ স্মরণীয়। সেই বছর জনসাধারণের মধ্যে যাতে বেতারের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটা সচেতন ভাব জাগ্রত হয়, সেই নিমিত্ত কতকগুলি পরীক্ষা-মূলক ব্রডকাষ্টের আয়োজন করা হয়েছিল। এই ব্রডকাষ্টের একমাত্র লক্ষ্য ছিল গীতবাদ্যের দ্বারা লোকের চিত্ত হরণ করা এবং এই ভাবে বেতারের সম্ভাবনার দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

এই উদ্দেশ্যে চেম্‌স্‌ফোর্ডে আমি একটি ষ্টেশন তৈরী করি এবং সেই চেম্‌স্‌ফোর্ডে বেতার ষ্টেশনের ষ্টুডিও থেকে ১৯২০

সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জনসাধারণের মধ্যে আনন্দ পরিবেশনের জন্যে আড়াই ঘণ্টাব্যাপী গীতবাদ্যের একটি অনুষ্ঠান করা হয়। সেই হলো প্রথম ব্রডকাষ্টিং প্রোগ্রাম। রিসেপ্‌সন কি রকম হয় তার জন্যে পৃথিবীর নানা জায়গায় সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চতুর্দ্দিক থেকেই খুব ভাল রিসেপ্‌সনের সংবাদ পাওয়া যেতে লাগলো। তখন জুন মাসে জগৎখ্যাতা গায়িকা লেডী মেলবাকে আমারা চেম্‌স্‌ফোর্ড ষ্টেশনে নিয়ে আসি এবং সেইখান থেকেই তিনি সর্ব্বপ্রথম ব্রডকাষ্ট করেন। এই ঘটনার পর থেকে বেতারের সাহায্যে ব্রডকাষ্টিং-এর সম্ভাবনা সম্বন্ধে সকলেই সচেতন হয়ে উঠলেন এবং ১৯২২ সালে অবশেষে আমার কোম্পানী (Writtle Station থেকে) জনসাধারণের আনন্দ-বিধানের জন্যে ব্যবসায়ের দিক থেকে গীতবাদ্যের প্রোগ্রাম ব্রডকাষ্ট করবার অধিকার পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের কাছ থেকে পেলো। এই হলো ব্রডকাষ্টিং-এর সূচনা।”

আমাদের পুরাণে বলে, পুরাকালে আমাদের দেশে মুনিঋষিরা তপোবনে বসেই শত যোজন দূরের ঘটনা চাক্ষুষ দেখতে পেতেন, সেখানকার কথা প্রত্যক্ষ ভাবে শুনতে পেতেন এবং প্রয়োজন হ'লে শত যোজন দূরে তাঁদের বাণীও প্রেরণ করতে পারতেন। পুরাণে বলে, অপূর্ব্ব যোগশক্তির বলে, তাঁরা এই অসাধ্য সাধন করতে পারতেন। তাঁদের নিকট দূরত্ব বলে কিছু ছিল না।

পুরাণের যুগের পর এল ইতিহাসের যুগ, লিখিত নজিরের, প্রত্যক্ষ প্রমাণের যুগ। যেখান থেকে প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ

পাওয়া যায়, সেইখান থেকে মানব-সভ্যতার ইতিহাস লিখিত হয়ে চলেছে। এই লিখিত ইতিহাসের কালের মধ্যে, যদি বলা হয়, মানুষের সাধনার বা চেষ্টার সৃজন-স্বরূপ কোন্ জিনিস পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করেছে, সভ্যতার গতিকে কোন্ জিনিস সকলের চেয়ে বেশী চলৎ-শক্তি দিয়েছে, তাহলে বলব, বেতার!

কোনও একজনের চেষ্টায় বেতার টেলিগ্রাফীর সৃজন সম্ভব হয় নাই। বহু দিনের বহু বৈজ্ঞানকের নানা তথ্যানুসন্ধানের পর, মানুষ এই বেতারের বিস্ময়ের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছে। কিন্তু সেই বহু-বৈজ্ঞানিকের বিভিন্ন তথ্যকে কাজে লাগিয়ে মার্কনী জগতে বিনা-তারে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণের ব্যবস্থাকে এক সফল বাস্তব মূর্ত্তি দিতে পেরেছিলেন। যতদিন মানব-সভ্যতা থাকবে ততদিন বেতারের নিত্য নব প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্থান-কাল-দেশ-জয়ী এই অমর প্রতিভার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মানব-সভ্যতার ইতিহাসের যদি পরিচ্ছেদ-ভাগ করতে হয়, তাহলে মূলত তাকে চারিটি অধ্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন—

প্রথম অধ্যায়, বাষ্পশক্তির আবিষ্কারের পূর্ব্বে।
দ্বিতীয় অধ্যায়, বাষ্পশক্তির যুগ।
তৃতীয় অধ্যায়, বৈদ্যুতিক শক্তির যুগ।
চতুর্থ অধ্যায়, বেতারের যুগ।

যেদিন ষ্টকটন্ থেকে ডার্লিংটনে প্রথম রেল-লাইনের ওপর

দিয়ে বাষ্প-চালিত লৌহ-যান বিস্ময়কর বেগে (ঘণ্টায় ৯ মাইল!) প্রধাবিত হ'ল, সেইদিন ইংলণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভ্য-জগতেরও ব্যবসা, বাণিজ্য, রীতি-নীতি, সমস্তই বদলে গেল। মানুষে মানুষে ব্যবধান, গ্রামে শহরে ব্যবধান, দেশে দেশে ব্যবধান, বহু অংশে কমে গেল। জাত যাবার ভয়ে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণেরা রেলকে কিছুদিন এড়িয়ে চললেন, তারপর ধীরে ধীরে সব চলে গেল। বিদ্যুৎ এসে সে ব্যবধান আরও দূরীভূত করল। বিদ্যুতের সাহায্যে মানুষের শক্তি সহস্র গুণ হয়ে গেল। দানবকে বন্দী করে যেমন, গল্পে শোনা যায়, এক রাত্রিতে হাজার মানুষের কাজ করিয়ে নেওয়া হ'ত, তেমনি বিদ্যুৎকে ধরে মানুষ অঘটন ঘটাতে লাগল। আমেরিকায় যা ঘটছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভারতবর্ষে বসে তা আমি জানতে পারছি—"হোথা আমেরিকা" বলে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয় না। তারপর এল বেতার! বেতারের কীর্ত্তির কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, বেশী দিন হয়নি সে শৈশব উত্তীর্ণ হয়েছে! কিন্তু ইতিমধ্যেই বেতার যে অঘটন সংঘটন করেছে, তাতে বলা যায়, আজ সমগ্র পৃথিবী একটি ছোট ঘরের মতন হয়ে এসেছে—কাকেও কিছু শোনাতে হলে, কারও জোরে চীৎকার করবার কোনও প্রয়োজন নেই; ছোট্ট ঘরে সকলের কথা সকলেই শুনতে পাচ্ছে। এক ঘরে, অতি ছোট্ট একটি ঘরে, সকলে মিলে থাকতে যেখানে আমরা বাধ্য সেখানে আর যাই

থাকুক, অপরিচয়ের সঙ্কীর্ণতা থাকতে পারে না, সেখানে অনাত্মীয়তার সঙ্কোচ ও বাধা থাকতে পারে না। মার্কনীর সৃষ্টি আজ সমগ্র পৃথিবীকে একটি গৃহে পরিণত করে মানব-মনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনা, সমগ্র মানব জাতিকে নিয়ে একটি মানব-পরিবারের স্বপ্নকে সফল করে তুলবার সুযোগ আমাদের নিকট এনে দিয়েছে।

ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, কত দিক থেকে কত ভাবে বেতার-টেলিগ্রাফী মানব-সভ্যতার ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। বিজ্ঞান চিরকাল মানুষের কল্যাণের জন্য নানা তথ্য ও আবিষ্কার করে চলেছে, কিন্তু সকল যুগেই দেখা যায় যে মানুষ সর্ব্বপ্রথম সেই সব তথ্য বা আবিষ্কারকে তার জয়লিপ্সা চরিতার্থ করবার কাজে লাগিয়েছে। আর্কিমিডিস্‌দের দিয়ে সব রাষ্ট্রই প্রথম চেয়েছে সারাসেনদের ধ্বংসের জন্য ক্যাটাপুল্‌ট্‌ তৈরী করাতে! যখন মহাযুদ্ধ প্রথম দেখা দিল, তখন বেতার-বিজ্ঞান আঁতুড় ঘরে বললেও চলে, কিন্তু আত্ম-রক্ষার তাগিদে প্রত্যেক যুধ্যমান জাতিই এই বেতারের সাহায্যে কি ভাবে পরস্পর পরস্পরকে বিপর্য্যস্ত করেছিল তার কাহিনী শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ কাহিনীর চেয়েও রোমাঞ্চকর। আজ যুদ্ধরীতির সঙ্গে বেতার-বিজ্ঞান বা বেতার-যন্ত্র অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। কামান না হলেও বোধ হয় আধুনিক যুদ্ধ হয়, কিন্তু বেতার-যন্ত্র ছাড়া আধুনিক বড় যুদ্ধ চালান খুব নিরাপদ নয়। কিন্তু বেতার তার জন্য সৃজিত হয় নি। মানুষকে চতুরতম ঘাতক করবার জন্য বিজ্ঞানের সাধনা নয়।

সাধারণ নাগরিকদিগের কাছে আজ বেতার আনন্দ-পরিবেশক রূপে পরিচিত। ঘরে বসে আজ আমরা বেতারের কৃপায় দেশ বিদেশের সঙ্গীত, নাটক, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের আলাপ আলোচনা শুনতে পাচ্ছি। ছেলে-মেয়েরা অথবা অন্তঃপুরচারিণীরা তাঁদের শিক্ষার এবং অবসর বিনোদনের জিনিস ঘরে বসেই জানতে এবং উপভোগ করতে পারছেন। বেতারের এই আনন্দ-পরিবেশক মূর্ত্তির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। এই মূর্ত্তিতে বেতার, বাইরের জঞ্জালকে বাদ দিয়ে বাইরের আনন্দকে ঘরে নিয়ে এসেছে—জগৎ জুড়ে আবালবৃদ্ধবনিতার আনন্দের উপকরণ ঘরে ঘরে বিলিয়ে চলেছে। মানুষের কর্ম্মশ্রান্ত সন্ধ্যার সঙ্গে, অবকাশের সঙ্গে, বিশ্রাম-সুখ কামনার সঙ্গে, রসতৃপ্তির সঙ্গে বেতার অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে।

কিন্তু যাঁরা শহরে থাকেন, দু'বেলা নানা আমোদ প্রমোদের সুবিধা ও সুযোগ পান, তাঁরা বেতারের এই আনন্দ-পরিবেশক মূর্ত্তি ভাল করে উপলব্ধি করতে পারবেন না। শহর থেকে, শহরের সমস্ত সুখ সুবিধা থেকে দূরে যাদের বাস করতে হয়, যেখানে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ঝিল্লিরবে প্রাণহীন নিস্তব্ধতা গাঢ় হয়ে ওঠে, সেখানে দেশদেশান্ত দিগ্‌দিগন্ত থেকে আগত নিত্য নব মানুষের কলগীতির যে কি সার্থকতা, তা সত্যই শহরে বসে উপলব্ধি করা যায় না। এ ছাড়াও আর একটি দিক আছে। আমাদের এই সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, জগতে কতকগুলি বড় বিচিত্র কঠিন দায়িত্ব আছে। যাঁদের সেই

সব কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় দুর্ব্বিষহ নির্জ্জনতাকে তাঁদের বরণ করে নিতে হয়। যেমন লাইটহাউসের রক্ষী, অরণ্য-রক্ষক, মরুভূমিতে প্রহরী। সমস্ত জগৎ জুড়ে এমনি বহু লোক, সভ্যতা থেকে, সমাজ থেকে একরকম নির্ব্বাসিত হয়ে সভ্যতার রথ-চক্রের পথ সংরক্ষণ করছে—তাঁদের কাছে বেতারে আগত মানব-প্রীতির যে কি মূল্য তা বলে শেষ করা যায় না। বেতার নির্জ্জনতার নীরবতাকে ভেঙে দিয়েছে।

কিন্তু তার এই আনন্দ-পরিবেশক মূর্ত্তির শেষ সার্থকতা সেখানে নয়। বেতার আজ লোকশিক্ষার বাহনরূপে মানুষের প্রধানতম সহায় হয়েছে। প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রে বেতারকে জন-শিক্ষার কাজে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং তাতে যে দ্রুত সুফল পাওয়া যাচ্ছে, তার পরিমাপ হয় না। যাকে আমরা আজ mass-education বলি, তার প্রসারে বেতার আজ মানুষের সব চেয়ে বড় সহায়। ভারতবর্ষের মত নিরক্ষর-প্রধান দেশে এইদিক দিয়ে বেতারের অবর্ণনীয় সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের অবস্থা, স্বাস্থ্যনীতি, রোগ নিবারণের উপায়, প্রয়োজনীয় সংবাদাদি, আবহাওয়া ও বাজারের খবর—এই সব জিনিস শুনে নিরক্ষর লোকদের যে মানসিক উৎকর্ষ এবং জাগতিক সুবিধা সাধিত হতে পারে, এই রকম ব্যাপকভাবে তা আর কিছুরই দ্বারা সম্ভব নয়। তাই বেতার আজ লোক-শিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহন হয়ে উঠেছে।

মানব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত,

তাঁরা জানেন যে, সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের সভ্যতার অগ্রগতির নিগূঢ় সম্পর্ক। সভ্যতার প্রথম দিন থেকেই মানুষের দুর্জ্জয় কামনা ছিল যে, সে সমুদ্রকে জয় করবে; দেশে দেশের মধ্যে এই ব্যবধান ঘুচে যাবে। তাই সভ্যতার আদিকাল থেকে "মহৎ ভয়ের" এই মূর্ত্তি, এই সাগরের সঙ্গে মানুষের চলেছে সংগ্রাম। মানুষ যখন তীর ছেড়ে নীরের আশ্রয় নেয়, তখন তীরের সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন সে থাকে সমুদ্রের দয়ার ওপর। বাষ্প বা বৈদ্যুতিক শক্তি মানুষকে তরঙ্গের ওপর দিয়ে চলে যাবার শক্তি এনে দিয়েছে বটে, তরঙ্গের ভয়কে দূর করতে পারে নি। বেতার সেই আদিম সমুদ্র-ভীতিকে জয় করেছে। আজ যখন মানুষ তার জন্ম-মৃত্তিকার ক্রোড় ত্যাগ করে অনিশ্চিত তরঙ্গের মধ্যে যাত্রা করে, তখন সে জানে সে এই মাটির পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বেতারের মারফৎ সে প্রতিমুহূর্ত্তে তীরের সঙ্গে সহস্র বন্ধনে বাঁধা। এই সংযোগের মধ্যে মানুষ আশ্বাস পেয়েছে, তাতে তার মন আজ সত্যই সমুদ্র-জয়ী হতে পেরেছে। বেতার আজ মানুষকে অকূলে কূল দিয়েছে।

বেতারকে আজ অপরাধীর সন্ধানের কাজে নানাদেশে লাগান হচ্ছে। নিউইয়র্ক বা সিকাগোতো পুলিসের মোটরগাড়ীর সঙ্গে বেতার-যন্ত্র সংযুক্ত থাকে। অপরাধীর গতিবিধি এবং খবরাখবর পেতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না। আগে অপরাধী ট্রেণে বা ষ্টিমারে দ্রুত পালিয়ে যেত।

আজকাল তার পালাবার আগেই ষ্টিমারে বা ষ্টেশনে তার সংবাদ গিয়ে পৌঁছোয়।

গত হিমালয়-অভিযানের সঙ্গে অথবা এ্যাড্‌মির্যাল ব্যার্ড-এর গত মেরু-অভিযানের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা জানেন যে মানুষের এই অসাধ্যসাধনের পথে বেতার মানুষকে আজ কতখানি শক্তি ও সহায়তা এনে দিয়েছে। বেতারের আয়োজন থাকলে পৃথিবী হয়তো স্কট্, আমুন্ড্‌সেন এবং নোবাইলকে হারাত না; এবং বেতার ছিল বলেই ব্যার্ড মেরু-কারাবাস থেকে ফিরে আসতে পেরেছেন; রাট্‌লেজ ২০ হাজার ফিট উঁচু থেকে মনসুনের সংবাদ পেয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করতে পেরেছিলেন। দুর্জ্জয়কে জয় করবার সাধনায় বেতার আজ মানুষের সব চেয়ে বড় সহায়।

আর একটি অতি মানব-হিতকর কাজে আজ পশ্চিমে বেতারকে নিযুক্ত করা হচ্ছে। ও-দেশে হাসপাতালে রোগীর বিছানার সঙ্গে বেতার-গ্রাহক যন্ত্র সংযুক্ত থাকে—যাকে ইংরাজীতে বলে Hospital Broadcast। যখন মানুষ হাস-পাতালে আসে, তখন, তার বাড়ী যদি দু'খানা বাড়ী পরেও হয়, তাহলেও সে কেমন যেন নিজেকে সেখানে প্রবাসী মনে করে। অন্তত আমাদের দেশে অধিকতর লোকের পক্ষে এই মনোভাবই সত্য। রোগীর মন হাসপাতালে এসে কেমন একটা অসহায় সঙ্গহীনতার দুঃখ অনুভব করে। পাশ্চাত্য দেশের হাসপাতালে, এমন কি বন্দীর নির্জ্জনকক্ষে, যাতে রোগী বা বন্দী বাইরের আনন্দগীতির সঙ্গে নিজেকে

সংযুক্ত করে রাখতে পারে তার আয়োজন করা হয়েছে।

বেতারের আবির্ভাবে আন্তর্জ্জাতিক কাল্‌চারের ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। জগতের যে কোন দেশের সমসাময়িক গতির সঙ্গে অন্য সব দেশ আজ প্রত্যক্ষ ভাবে বেতারের মারফৎ সংযুক্ত থাকতে পারে। আজ রোমে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে, সেই মুহূর্ত্তে নিউইয়র্কে বসে, কলিকাতায় বসে, অন্য সকল দেশের লোকের সঙ্গে আমিও তা শুনছি। এই ভাবে প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক রাষ্ট্র পরস্পর পরস্পরের মনের সীমানার মধ্যে এসে পড়েছে এবং তার ফলে আন্তর্জ্জাতিক কাল্‌চারের ক্ষেত্রে যে পরিবর্ত্তন আজ সংঘটিত হচ্ছে, আজ হয়ত তার পরিমাপ নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হবে না, কিন্তু তার প্রভাব অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই।

Published by N. Mukherjee from 2, College Square, Calcutta 12
and printed by M. Mukerjee at 2, Nayaratna Lane, Calcutta 4.